কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

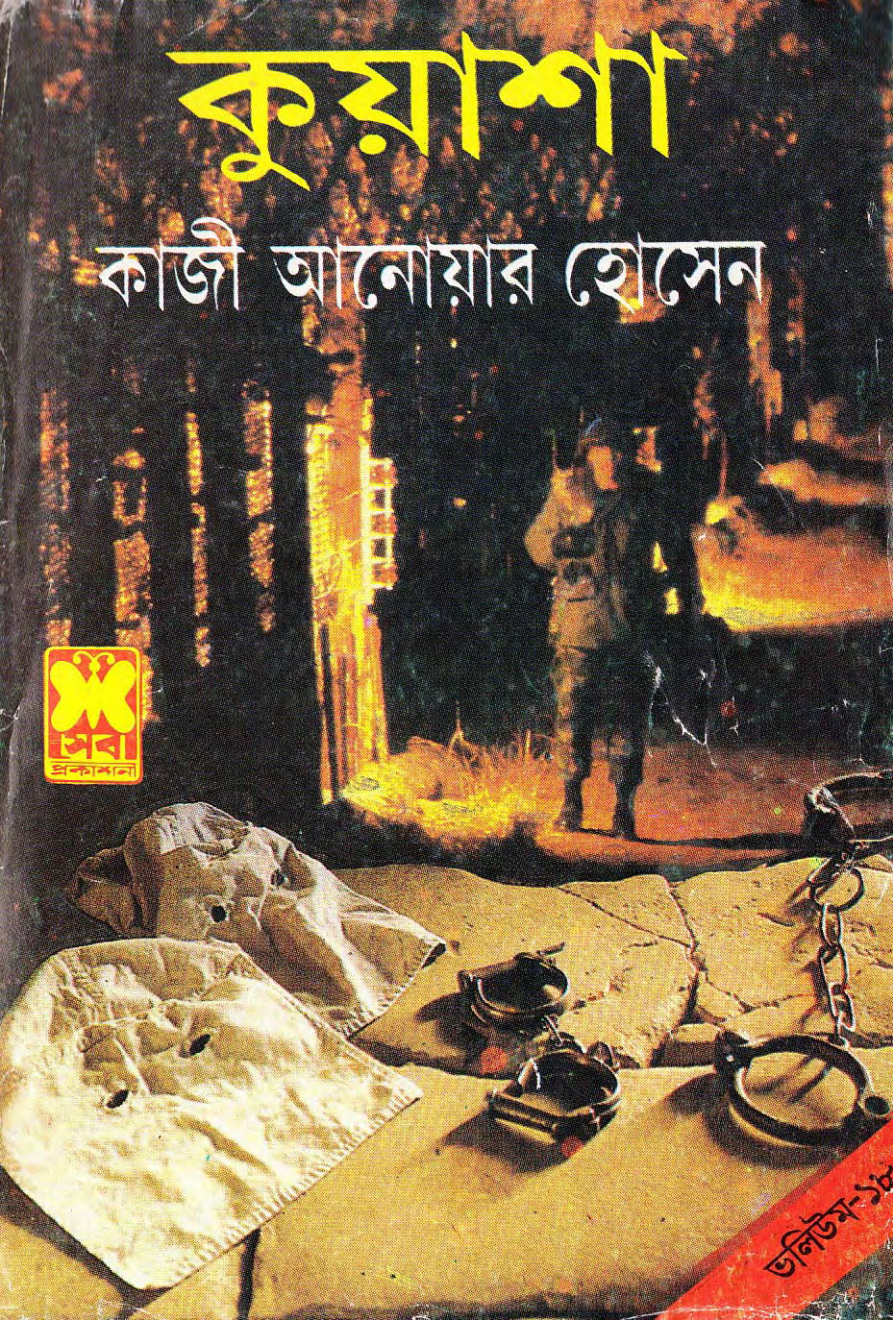

কুয়াশা ৫২	৫—৫০
কুয়াশা ৫৩	৫১—৯৭
কুয়াশা ৫৪	৯৮—১৪৪

কুয়াশা ৫২

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৬

এক

কামাল এবং রাজকুমারীকে কাবু করে শত্রুদল উল্লাসে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল। কিন্তু হাতে বড় আকারের ঘড়িওয়ালা একজন চিৎকার করে উঠল, 'সোলায়মান ছাড়া সবাই যে যার কাজে চলে যাও। আমরা পরবর্তী হুকুমের জন্যে থাকব কিছুক্ষণ এখানে।'

উল্লাসধ্বনি থামল। সবাই চলে গেল বাড়ি ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আরও খানিক পর দলপতির নির্দেশ এল, 'কামাল এবং কুয়াশার সহকারিণী রাজকুমারী ওমেনাকে হত্যা করো!'

হুকুম পেয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করল শত্রুদলের দু'জন।

ইতিমধ্যে অজ্ঞান কামাল এবং রাজকুমারীকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। জ্ঞান এখনও ফেরেনি ওদের। দুই শত্রু ওদের দু'জনের দিকে দুটো রিভলবার তাক করল।

অকস্মাৎ গর্জে উঠল একটি পিস্তল পর পর দু'বার।

কামরার মেঝেতে শত্রুদের দেহ দুটো লুটিয়ে পড়ল। বুক ভেদ করে গেছে বুলেট একজনের, অপরজনের মাথা ফুটো হয়ে গেছে। গুলিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

কিন্তু কামরার ভিতর কেউ প্রবেশ করল না।

জ্ঞান ফিরল ওদের খানিক পরই। চোখ মেলে দুটো লাশ দেখে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না ওদের।

রাজকুমারী নিজের হাতের বাঁধন খুলে ফেলল অনায়াসে। কামালের পা দুটোও বাঁধা হয়েছে। খুলে দিল রাজকুমারীই।

'ব্যাপারটা কি? শত্রুদের অনুচররা খুন হলো কিভাবে?'

রাজকুমারী উত্তর না দিয়ে বলল, 'বাড়িটা একবার সার্চ করা দরকার।'

বাড়ি সার্চ করে কাউকে না পেলেও কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল, যা দেখে বোঝা গেল বাড়িটার মালিকের নাম সাঈদ চৌধুরী। বাড়ির উপরতলায় একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি দেখা গেল। কিছু কিছু কাগজপত্রে একটি মেয়ের নাম কয়েকবার দেখা গেল।

মেয়েটির নাম সাঈদা শরমিন। বোঝা গেল সাঈদ চৌধুরীর মেয়ে হলো সাঈদা শরমিন।

'এই সাঈদা শরমিনই কিন্তু কুয়াশাকে অনুসরণ করছিল। কুয়াশা একেই

দেখেছিল মোখলেসুর রহমানের অফিসে।'

রাজকুমারীকে চিন্তিত দেখাল। কিছু যেন ভাবছে সে। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে নিষ্পলক এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন। কামাল চেয়ে রইল তার দিকে। গভীর ভাবে কিছু যেন অনুভব করার চেষ্টা করছে রাজকুমারী।

কামাল বিরক্ত করল না ওকে।

খানিক পর নড়ে উঠল রাজকুমারী। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো। কপালে ঘামের বিন্দু।

'কামাল! সর্বনাশ! কুয়াশা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে—বাঁচার কোন আশাই নেই! কিংবা···কিংবা···এতক্ষণে হয়তো সে···।'

রাজকুমারী বিষ্যৎ দেখতে পায়। আজ পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি।

তার কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কামাল। হঠাৎ সে লক্ষ করল, থর থর করে কাঁপছে সে! 'কোথাও কোন ভুল হয়নি তো তোমার?'

রাজকুমারী ছুটতে শুরু করল। ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'ভুল না, কামাল। ভুল আমার হয় না!'

কামাল ছুটল রাজকুমারীর পিছু পিছু।

ট্যাক্সিটা ওদের কথামত অপেক্ষা করছিল তখনও। তবে ট্যাক্সিটা ছিল বনজঙ্গলের আড়ালে। ওদেরকে দেখে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। বলল, 'খানিক আগে কয়েকজন গুণ্ডা চেহারার লোককে যেতে দেখে লুকিয়েছিলাম আমি।'

রাজকুমারী জানতে চাইল, 'আর কাউকে দেখোনি চলে যেতে?'

'দেখেছি। সুন্দরী একটি যুবতী মেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল···'

রাজকুমারী তাকাল কামালের দিকে।

'সাঈদা শরমিন?'

রাজকুমারী উত্তর দিল না। ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করেছে। বড় রাস্তায় ট্যাক্সি উঠতেই ওরা ধূম্র কুণ্ডলী এবং অগ্নিশিখা দেখতে পেল। দক্ষিণ দিকের আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়।

'শহরের মাঝখানে কোথাও আগুন লেগে গেছে!'

রাজকুমারী আনমনে বলল, 'কুয়াশা আটকা পড়েছে ওই আগুনের ভেতরই, সম্ভবত। তার সাথে আর একজন আছে···সম্ভবত শহীদ ভাই।'

ট্যাক্সি শহরে পৌঁছুল।

এদিকে শহরের মধ্যস্থলের সেই বিল্ডিংয়ের সর্বাঙ্গ গ্রাস করেছে আগুন। মি. সিম্পসনের মুখটা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে। জীপে বসে লাউডস্পীকারের মাউথপীসে মুখ ঠেকিয়ে অবিরাম নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি ফায়ারব্রিগেডের কর্মীদেরকে।

আগুন নেভাবার জন্য দমকল বাহিনীর অনেকগুলো গাড়ি এসে গেছে। হোস পাইপ থেকে অনর্গল পানির মোটা ধারা নিক্ষেপ করা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের দিকে। কিন্তু আগুন নেভা তো দূরের কথা, তা যেন আরও ব্যাপক হয়ে আরও আয়ত্তের বাইরে

চলে যাচ্ছে।

আসলে, দমকলবাহিনীর কর্মীরা হাল ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। এ আগুন নেভানো সম্ভব নয়, তাদের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে। তারা চেষ্টা করছে আগুন যাতে পাশের বাড়িগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

বিল্ডিংটার চারদিকে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়েছে খবর। সবাই জানে, কুয়াশা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর আটকা পড়ে গেছে। তার সাথে শহীদও আছে।

বিশ মাইল দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে অগ্নিশিখা এবং ঘন কালো ধূম্র কুণ্ডলী। কিন্তু টেলিফোনে, ওয়্যারলেসে খবর ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে দেশের সর্বত্র। সবাই এখন জানে কুয়াশা এবং শহীদের বাঁচার কোন আশাই নেই।

ওই বিল্ডিংয়ের ভিতরে কেউ যদি থাকে, নির্ঘাৎ সে বেঁচে নেই—এ ব্যাপারে সন্দেহ করা বোকামি।

কুয়াশার এমন বিপদের কথা শুনে শহরের হাজার হাজার নিঃসম্বল মানুষ ছুটে এসেছে।

পুলিস কর্ডন করে ঘিরে রেখেছে গোটা এলাকাটা। সেই কর্ডন ভেদ করে জ্বলন্ত বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই কারও।

রাজকুমারী এবং কামাল যখন ভিড় ঠেলে, পুলিসের কর্ডন ভেদ করে মি. সিম্পসনের কাছে পৌঁছুল তখন রাত সাড়ে সাতটা।

মি. সিম্পসনের চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল দেখাচ্ছে। টপটপ করে ঘাম পড়ছে তাঁর কপাল থেকে। সরকারী গোয়েন্দারা রয়েছে তাঁর চারপাশে, সবাই বোকার মত চেয়ে আছে আগুনের দিকে। মি. সিম্পসন উন্মাদের মত পায়চারি করছেন রাস্তার উপর।

ছুটন্ত জুতোর হিলের শব্দ শুনে সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। কামাল এবং রাজকুমারীকে ছুটে আসতে দেখে বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর মুখের চেহারা। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

'কি খবর, মি. সিম্পসন?' কামাল হাঁপাচ্ছে।

সংক্ষেপে খণ্ডযুদ্ধের কথা এবং মাইক্রোফোনে কুয়াশার সাবধানবাণীর কথা বর্ণনা করল একজন গোয়েন্দা। মি. সিম্পসন পায়চারি করছেন আবার। কথা বলার মত মনের অবস্থা নেই তাঁর এখন।

সরকারী গোয়েন্দা বলছে এখনও, 'মি. কুয়াশা যদি সময় মত সাবধান করে না দিতেন তাহলে কয়েকশো লোক মারা পড়ত। আহত হয়েছে মাত্র কয়েকজন, বিস্ফোরণের সময় ইঁটের আঘাতে।'

রাজকুমারীকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে। সে জানতে চাইল, 'আর যাদেরকে পালাতে দিতে নিষেধ করেছিল কুয়াশা?'

'তাদের ছায়াও দেখতে পাইনি। শয়তান দুটো নিশ্চয়ই নিজেদের ফাঁদে পড়েছে—এতক্ষণে ছাই হয়ে গেছে পুড়ে।'

কামাল তখনও গোটা ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেনি। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'কুয়াশা কোথায়? শহীদ কোথায়? আমি জানতে চাই···।'

সরকারী গোয়েন্দা হঠাৎ কি মনে করে মাথা নিচু করল, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সরে যাবার জন্যে। পিছন থেকে থাবা মারল কামাল তার কাঁধে। গোয়েন্দার কাঁধ ধরে টান মারল, ভদ্রলোক চলে এল কামালের একেবারে পাশে।

আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছে কামালের চোখ দুটো। কোটর ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসবে চোখের মণি দুটো। আবার সে চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাপার কি?'

'আমি···মানে, বলতে চাইছি···মি. কুয়াশা এবং মি. শহীদ ওই আগুনের ভিতর···।'

'শহীদ!' আর্তনাদ করে উঠল কামাল। পরমুহূর্তে হিংস্র বুনো জন্তুর মত ছুটল সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

মি. সিম্পসন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দেখছেন তিনি। কিন্তু কর্তব্যের কথা ভুলে গেছেন, কামালকে ছুটে যেতে দেখেও তাঁর গলা থেকে কোন শব্দ বের হলো না।

সরকারী গোয়েন্দারা এবং দমকলবাহিনীর কর্মীবৃন্দ ছুটল। কয়েকজন পুলিস অফিসারও যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে।

ধরে ফেলল সবাই মিলে কামালকে।

পাগল হয়ে গেছে যেন কামাল। চোখ ভরা পানি তার। উন্মাদের মত হাত-পা ছুঁড়ছে ছাড়া পাবার জন্য। চিৎকার করছে পাগলের মত, 'ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমাকে! ওকে আমি উদ্ধার করে আনবই···ছেড়ে দিন আমাকে···।'

কামালের পাশেই দাঁড়িয়ে শুনছিল ডি. কস্টা এবং রাসেল সরকারী গোয়েন্দার কথাগুলো। হঠাৎ রাসেল লক্ষ করল, ডি. কস্টাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এখান থেকে হাসপাতাল খুব দূরে নয়। বিস্ফোরণের শব্দই শুধু পায়নি ওরা, বিস্ফোরণের ধাক্কায় হাসপাতাল ভবনটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, ভেঙে গিয়েছিল জানালার কাঁচ। খানিক পরই নার্সের কাছে আসল খবর জানতে পারে ওরা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওদেরকে রিলিজ অর্ডার না দিলেও শারীরিকভাবে ওরা পুরোপুরি সুস্থই হয়ে উঠেছে কুয়াশার দেয়া আশ্চর্য ক্যাপসুল খেয়ে এবং ইঞ্জেকশন নিয়ে।

হাসপাতাল থেকে দ্রুত চলে এসেছে ওরা হেঁটেই। এসে দেখে কামাল এবং রাজকুমারী সরকারী গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলছে।

রাসেল এদিক ওদিক তাকিয়ে ডি. কস্টাকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে গেল। লোকটাকে ভাল করেই চেনে সে। কুয়াশার এমন বিপদের সময় তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেহায়েত কম নয়।

রাসেল মি. সিম্পসনের দিকে পা বাড়াল। উদ্দেশ্য, তিনি ডি. কস্টাকে

দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করা।

কিন্তু রাসেল কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই মি. সিম্পসন অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'মাই গড! ওহ্ মাই গড! বোকার দল তোমরা সবাই করছ কি? একজন মানুষকে তোমরা মেরে ফেললে—মাই গড!'

সবাই তাকাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে।

হাঁ হয়ে গেল সকলের মুখ। বিল্ডিংয়ের একতলাটায় তখনও আগুন ধরেনি। ডি. কস্টাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আগুনের অসহ্য উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেছে সে উঠানে। ক্রল করে এগোচ্ছে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে আরও সামনে, জ্বলন্ত লাল মৃত্যুর দিকে।

'গুলি করব আমি! এতগুলো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গেল কি করে ডি. কস্টা ওখানে! এর জন্য যারা দায়ী তাদের সবাইকে আমি গুলি করব!'

দিশেহারার মত ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল দমকলবাহিনীর কর্মীদের মধ্যে। একটা ক্রেনের মাথায় চড়ে বসল দু'জন কর্মী। ক্রেনের স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগোচ্ছে।

এদিকে চিৎকার করছে মি. সিম্পসন, 'মি. ডি. কস্টা! মি. ডি. কস্টা! মি. ডি. কস্টা···!'

কিন্তু অগ্নিশিখার নৃত্যের শব্দে, বিল্ডিংয়ের অগ্নিদগ্ধ ইঁট-কাঠ সিমেন্ট-লোহা পতনের আওয়াজেই কান পাতা দায়, মি. সিম্পসনের কণ্ঠস্বর কানেই গেল না ডি. কস্টার।

এগিয়ে চলেছে সে। একটা কথা তার সম্পর্কে প্রচলিত ছিল, কুয়াশাও সে কথা বলত, যত ভানই করুক, আসলে ডি. কস্টা নাকি ভয় বলে কোন শব্দের সঙ্গে পরিচিত নয়। কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারত না। কিন্তু আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে কথাটা এক বিন্দু মিথ্যে নয়।

কুয়াশা' প্রজ্জ্বলিত বিল্ডিংয়ের ভিতর আছে একথা শোনার পর ডি. কস্টা সকলের অজ্ঞাতে এগিয়ে গেছে।

এগিয়ে চলেছে সে। এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে, যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না।

অসহ্য উত্তাপে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে বলে মনে হলো ডি. কস্টার। মৃত্যুর এত কাছাকাছি চলে এসেছে সে, অথচ এতটুকু ভয় করছে না তার।

তার চারদিকে ছুটে এসে পড়ছে জ্বলন্ত ইঁট, কাঠ, কংক্রিটের বড় বড় চাঙ। ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

ক্রেনটা নেমে এসেছে ডি. কস্টার পিঠের উপর। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে দু'জন লোক। লোক দু'জন ডি. কস্টার শার্ট ধরে ফেলল।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ডি. কস্টা। দাঁতে দাঁত চাপল সে। কি যেন বলল মাথা নেড়ে। হাত উঁচু করে ঝাপটা মারল। তার সেই হাত খপ্ করে ধরে ফেলল একজন লোক। অপরজন ডি. কস্টার পা দুটো ধরে ফেলল দুই হাত দিয়ে।

ক্রেন আবার উঠতে শুরু করল উপর দিকে।

ডি. কস্টাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে দমকলবাহিনীর কর্মী দু'জন।

ডি. কস্টা ও দমকলবাহিনীর কর্মী দু'জনকে নিয়ে ক্রেনটা যখন রাস্তার উপর নেমে এসেছে, এমন সময় ঘটল বিস্ফোরণ।

সেই কান ফাটানো, গগনবিদারী আওয়াজের কথা এ যুগের ঢাকাবাসী কখনও ভুলবে না।

বিস্ফোরণের শব্দটা এমনই ভয়ঙ্কর যে সেই শব্দের ধাক্কায় দমকলবাহিনীর কর্মীরা, পুলিস অফিসারবৃন্দ, উপস্থিত বাকি সবাই, যেন ভীষণ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল রাস্তার উপর।

বিস্ফোরণের শব্দের পরই গোটা আটতলা বিল্ডিংটা ধসে পড়ল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বিশাল অট্টালিকার কাঠামোটা। চোখের পলকের মধ্যে দেখা গেল উঁচু বিল্ডিংটার আর কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানে বিল্ডিংটা ছিল সেখানে শুধু ইঁট, কাঠ, লোহা, আর কংক্রিটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে।

স্তূপটা জ্বলছে ভীষণভাবে। আগুন ছাড়া কোথাও কিছু নেই। দাউ দাউ আগুন শুধু নিদারুণ উল্লাসে যেন স্তূপের উপর উন্মত্ত ভঙ্গিতে নাচছে।

মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন সেদিকে। চেয়ে আছে সবাই। কামাল, রাসেল, ডি. কস্টা—উপস্থিত সবাই।

মি. সিম্পসন নিজের মাথার চুল ধরে টানছেন। অনর্গল ধারায় দু'চোখ থেকে গাল বেয়ে নোনা অশ্রু বেরিয়ে আসছে তাঁর।

পাথরের মূর্তির মত অগ্নিস্তূপের দিকে চেয়ে আছে সবাই। কারও মুখে কথা নেই, কারও চোখে পলক নেই।

'নো! নো! নো!' অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন মি. সিম্পসন। তারপর শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

'শহীদ! আমাকে ফেলে রেখে চলে গেলি তুই!' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে টলতে টলতে এক পা এগোল কামাল, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে রাস্তার উপর।

সবাই হতভম্ব। কেউ ধরতে এল না কামালকে।

শুধু একজন, রাজকুমারী ওমেনা, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখের চেহারা দেখে মনের অবস্থা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আরও কিছু ঘটবে এই আশায় যেন অপেক্ষা করছে সে।

দুই

এদিকে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও বসে নেই।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংটার সাততলাটা কারা দখল করে ছিল তা আবিষ্কার করে ফেলল তারা। দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকা নামের দুই সাংবাদিক ছিল সাততলায়। তারা এশিয়ার এক বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিক। আবাসিক সংবাদদাতা হিসেবে ঢাকায় বসবাস করছে বছর তিনেক থেকে।

কিন্তু বিল্ডিংটার প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্টরা সন্দেহ করল, বিল্ডিংটার মালিক দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকাই। কিন্তু বিল্ডিংয়ের মালিক হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করত না তারা।

গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক চলল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সেক্রেটারি মিলিটারি এবং সিভিল অফিসারদের জানালেন, মি. কুয়াশা এবং সম্ভবত মি. শহীদ বেঁচে নেই বলেই জানা গেছে।

এদিকে সারা রাত ধরে চলল আগুন নেভাবার সংগ্রাম।

সকাল হয়ে যেতে দেখা গেল আগুন আগের মতই জ্বলছে। এতটুকু কমেনি আগুনের নৃত্য। তবে ইঁট-কাঠ-পাথর-সিমেন্ট-লোহার স্তূপটা তুলনামূলকভাবে ছোট হয়ে গেছে।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। দুপুরের দিকে দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারায় কামাল। দু'জন ডাক্তার তাকে দেখাশোনা করছে। হাসপাতাল বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাকে। রাজি নয় সে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে কোথাও যেতে।

যায়নি কেউই। রাস্তার উপর সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেই গত রাত সাড়ে সাতটা থেকে। ছাই উড়ে এসে সকলের কাপড়চোপড় কালো করে ফেলেছে। কালো, বিকৃত হয়ে গেছে সকলের চেহারা। খুঁটিয়ে কাছাকাছি থেকে না দেখলে চিনবার উপায় নেই কাউকে।

মোটা মোটা অসংখ্য পাইপ থেকে অবিরাম পানি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। কোন কাজ হচ্ছে না। ভারী মেঘের মত ঘন ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে শুধু আকাশের দিকে।

বিকেলের দিকে সেই ঘন কালো ধোঁয়া পাতলা হয়ে এল। দমকলবাহিনীর কর্মীরা সেই সময় ধ্বংসস্তূপের ভিতর কয়েকটা প্রকাণ্ড আকারের চারকোণা তোবড়ানো জিনিস লক্ষ করল, দেখে মনে হয় ইস্পাতের কামরা এক একটা।

একটি ইস্পাতের কামরা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সকলের। সেই কামরার ইস্পাতের দেয়ালে ফুটো হয়ে গেল হঠাৎ!

পানির পাইপের মুখগুলো ঘুরে গেল সেদিকে। শুধুমাত্র সেই বিশেষ ইস্পাতের কামরার দিকে পানি নিক্ষেপ শুরু হলো।

ইস্পাতের কামরাটির আশপাশের আগুন নিস্তেজ হয়ে পড়ল ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায়। কিন্তু, তারপরও, কিছু ঘটল না।

এদিকে কামালের জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডি. কস্টা, মি. সিম্পসন, রাজকুমারী, রাসেল দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, দেখছে তারা ইস্পাতের কামরাটা। গোল গর্তটাও পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কামরাটার দেয়ালে। কামাল তাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

সবাইকে মৃত মনে হচ্ছে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এক একজন এক একটা মর্মর মূর্তি।

সময় বয়ে চলেছে।

এমন সময়, হঠাৎ ইস্পাত নির্মিত কামরার দেয়ালের গোল গর্ত থেকে বেরিয়ে

এল একটি তুষার মানব!

অন্তত তুষার মানব বলেই মনে হলো তাকে। তার দেহ বরফ এবং তুষারে সম্পূর্ণ ঢাকা। পাতলা ধোঁয়া মত বাষ্প উঠছে বরফ থেকে। তুষার মানব মুখ হাঁ করল, গলগল করে বেরিয়ে এল বাষ্প। বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে, এগিয়ে আসছে রাস্তার দিকে।

দ্বিতীয় তুষার মানবকে সবাই দেখতে পেল তারপর। দ্বিতীয় তুষার মানবটি প্রথমটির চেয়ে আকারে বেশ বড়। দৃঢ়, বলিষ্ঠ পায়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে সে।

দমকলবাহিনীর কর্মীরা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ধ্বংসস্তূপের উপর পানি ফেলে আগুন নেভাতে তৎপর হয়ে উঠল তারা, তুষার মানবদের জন্য পথ তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগে গেল।

রাস্তায় উঠে এল তুষার মানবদ্বয়।

মি. সিম্পসন বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন।

কামাল অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে। রাসেল এতটুকু নড়ছে না। ডি. কস্টাকে দেখে মনে হলো, এই বুঝি কেঁদে ফেলল সে। শুধুমাত্র রাজকুমারী হাসছে—আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার অপূর্ব সুন্দর মুখটা।

প্রথম তুষার মানব তার গলার কাছে হাত রেখে কি যেন ধরে সজোরে টান মারল, মাথার বরফসহ একটা হুড খসে পড়ল রাস্তার উপর। তুষার মানবের মুখটা দেখা গেল এবার।

বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। অসম্ভব ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তার। কামাল এবং রাসেল ছুটল তার দিকে।

প্রথম তুষার মানব হচ্ছে শহীদ খান। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে শহীদ বলে উঠল, 'আর একটু হলে বরফ হয়ে যেতাম ঠাণ্ডায়। এত ঠাণ্ডা কি মানুষ সহ্য করতে পারে?'

দ্বিতীয় তুষার মানবও তার মাথার হুড খুলে ফেলেছে। কুয়াশাকে হাসতে দেখা গেল। বলে উঠল সে, 'সত্যি, বড় বিশ্রী অভিজ্ঞতা!'

অ্যাসবেসটসের পোশাক খুলে ফেলল ওরা।

শহীদ হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ঘটনাই বলে ফেলল ও ধীরে ধীরে।

'কুয়াশা মাইক্রোফোনে সাবধান করে দিয়েছিল, তার কারণ থারমাইট বোমাগুলো লক্ষ করে সে বন্দী হবার আগেই। বোমাগুলোই দেখেনি সে, অ্যাসবেসটসের পোশাকের প্যাকেটও দেখতে পায় সেই সাথে। দুটো প্যাকেট সে নিজের কাছে রাখে, কাজে লাগবে মনে করে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন মি. সিম্পসন। শহীদ সেটা নিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল। আগুন ধরিয়ে দিল কামাল।

কুয়াশা মুচকি মুচকি হাসছে।

আবার শুরু করল শহীদ, 'লেসাবগানটা ছিল কুয়াশার কাছে। কিন্তু সেটা

ব্যবহার করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি ও। ওর উদ্দেশ্য ছিল আমাকে উদ্ধার করা। কিন্তু আমাকে উদ্ধার করতে করতে যা ঘটবার ঘটে গেল। লেসারগান ব্যবহার করেনি কুয়াশা, কারণ ও জানত থারমাইট বোমা ফাটানো হবে, আগুন গ্রাস করবে বিল্ডিংটাকে। ইস্পাতের যে কামরায় আমি বন্দী ছিলাম সেটা এমনই মোটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি যে সাধারণ আগুন তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। লেসারগান ব্যবহার করে সেই কামরায় কুয়াশা ঢুকতে পারত ঠিকই, কিন্তু তাতে গর্তের সৃষ্টি হত, এবং পরে সেই গর্ত দিয়ে আগুন প্রবেশ করত। যাক, কুয়াশা করিডরে বন্দী হয়েছিল। করিডরের দেয়ালেই ছিল একটি সুইচ। সেটা কারও চোখে ধরা পড়ার কথা নয় কিন্তু কুয়াশা ঠিকই দেখতে পায় বোতামটা। বোতামটা আসলে আমার কামরায় ঢোকার চাবিকাঠি ছিল। সেই বোতামে চাপ দিতেই আমার কামরার দেয়াল দু-ফাঁক হয়ে যায়, কুয়াশা প্রবেশ করে ভিতরে, দেয়াল আবার স্বয়ংক্রিয় ভাবে জোড়া লেগে যায়। কুয়াশার পরামর্শে তখুনি আমি অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি পোশাকটা পরে ফেলি। কুয়াশাও পরে নেয়। তারপরই ঘটে বিস্ফোরণ।'

'মাই গড! তুমি দেখছি রূপকথা শোনাচ্ছ আমাদেরকে!'

শহীদ হাসল। বলল, 'রূপকথার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, সত্যি! বেঁচে আছি ভাবতে সত্যি বড় অবাক লাগছে। অমন ঠাণ্ডায় কেউ বেঁচে থাকতে পারে ভাবা যায় না···।'

সবাই হেসে উঠল।

শহীদ বলতে শুরু করল আবার, 'বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছিলাম এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করেছিলাম আমরা। তাছাড়া বিশেষ কোন ব্যাপার টের পাইনি। শুধু, ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল। অবশ্য, গোটা বিল্ডিংটা যখন ধসে পড়ল তখন দু'জনে বেশ খানিকক্ষণ গড়াগড়ি খেয়েছি কামরার মেঝেতে। কিন্তু কামরাটা উপর থেকে সরাসরি নিচে পড়েনি, তাই রক্ষে। তাহলে থেঁতলে যেত শরীর। রয়ে সয়ে, ধীরে ধীরে কামরাটা নিচে পড়ে যায়। তাই বিশেষ ব্যথা-ট্যথা পাইনি। যাক, এরপর আমাদের করার কিছুই ছিল না। অপেক্ষা করা ছাড়া। যখন অনুমানে বুঝলাম যে আমাদের কামরার চারদিকে বিশেষ কোন বাধা নেই তখন কুয়াশা লেসারগান ব্যবহার করে দেয়ালে গর্তের সৃষ্টি করল···তারপর তো তোমরাই সব দেখেছ।'

'কিন্তু অ্যাসবেসটসের পোশাকে তুষার এল কোত্থেকে!' কামাল জানতে চাইল।

শহীদ পোশাক খুলে ফেলেছে। কুয়াশাও। দমকলবাহিনীর লোকেরা পোশাক দুটো পরীক্ষা করছে।

শহীদ বলল, 'পোশাক দুটো পরীক্ষা করে দেখলেই রহস্যটা জানতে পারবি। পোশাকগুলো অস্বাভাবিক মোটা, লক্ষ করেছিস? এয়ার প্রুফ তো বটেই, ফাঁপাও বটে। ফাঁপা জায়গাটায় উন্নত ধরনের অ্যামোনিয়া সলিউশন আছে, এই সলিউশন ব্যবহার করা হয় রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে, যা উত্তাপ পেলে বরফ উৎপাদন করতে

পারে। উত্তাপ পেয়ে পোশাকের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় বাতাস আলোড়িত হয়, স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকে। ফাঁপা জায়গাটায় অসংখ্য কয়েল আছে, কনডেনসার হিসেবে কাজ করে সেগুলো। মোট কথা, পোর্টেবল রেফ্রিজারেটরের ভিতর ছিলাম আমরা। তবে অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেতাম, যদি না কুয়াশার সাথে অক্সিজেন ক্যাপসুল থাকত।'

কুয়াশার মুখের হাসি উবে গেছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হয়নি। শত্রুপক্ষ এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এখুনি এখান থেকে সরে পড়া দরকার আমাদের।'

'কিন্তু তোমরা বেঁচে আছো তা এখনও জানে না শত্রুরা—।'

কুয়াশা যেন শুনতে পায়নি মি. সিম্পসনের কথা। 'এখুনি কাজ শুরু করা দরকার! আবার একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে।'

সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে। বাজে কথা বলার লোক সে নয়। নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পেরে বলছে কথাটা।

এমন সময় একজন গোয়েন্দাকে পুলিস কর্ডন ভেদ করে ছুটে আসতে দেখা গেল এদিকে।

চিৎকার করছে, 'কী আশ্চর্য! আপনারা বেঁচে আছেন! কিন্তু···মি. কুয়াশা, দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আবার একটা!' হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দা। দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল সে, 'আমাদের একজন সহকর্মী খানিক আগে ফোন করে জানায় যে সে গোপন একটা খবর পেয়েছে। খবরটা হলো, আর্মি প্রুভিং গ্রাউণ্ডের মত একটা দুর্ঘটনা অচিরেই ঘটবে। কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় মৃত্যু আঘাত হানবে তা সে জানতে পারেনি! তার বক্তব্য ছিল, খবরের সূত্রটি অখেনটিক···'

'বক্তব্য ছিল?' দ্রুত জানতে চাইল কুয়াশা।

গোয়েন্দা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের সেই সহকর্মীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। তাকে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে তার লাশ।'

সবাই নিশ্চুপ! দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ দমন করার চেষ্টা করছেন মি. সিম্পসন। শহীদের মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

গোয়েন্দা হাত নেড়ে বলে উঠল আবার, 'কিছু একটা করতেই হবে, মি. কুয়াশা! আমরা এই নির্মম নাটকের নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে পারি না! কিছু একটা করতেই হবে আমাদের! তা না হলে কয়েকশো মানুষ খুন হবে আবার!'

তিন

কামাল, ডি. কস্টা এবং মি. সিম্পসনকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিল কুয়াশা। রাজকুমারী এবং শহীদকে নিয়ে ফিরে এল সে হোটেলে।

রাত বাড়ছে। পায়চারি করছে কুয়াশা রুমের মেঝেতে। মাঝে মাঝে দেয়াল

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে সে।

কামাল এল রাত সাড়ে দশটায়। বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, কুয়াশা। গত রাতে পাঁচজন আরোহীকে নিয়ে একটা চার্টার্ড প্লেন টেক-অফ করেছে। আরিফ নামে একজন পাইলটও ছিল প্লেনে। প্লেনটা দিনাজপুর যাবার কথা। কিন্তু এ খবর তুমি জানলে কিভাবে?'

মি. সিম্পসন এলেন। বললেন, 'শফিফুল কবীরকে যে গোয়েন্দা অনুসরণ করছিল সে মেসেজ পাঠিয়েছে আজ সকালে চট্টগ্রাম থেকে। মেসেজে সে জানিয়েছে, শফিফুল কবীর কক্সবাজারের দিকে রওনা হবে বলে মনে হচ্ছে।'

ডি. কস্টা এল একটা ব্যাগ নিয়ে। কুয়াশা তাকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিল।

কুয়াশা বলল, 'মি. ডি. কস্টা, আমাদের হেলিকপ্টারটা এখন কোথায়?'

'ঢাকাতেই আছে। পাঁচ নম্বর আস্তানায়।'

'গুড। আপনি এখনি পাঁচ নম্বরে চলে যান। ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে চেক করিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা জেনে আমাকে খবর দেবেন। আমরা প্রথমে চট্টগ্রাম যাব, সেখান থেকে দরকার হলে যাব কক্সবাজারে। দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকাকে আমরা চাই। ওরা গতরাতের প্লেনে দিনাজপুরের দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু আসলে তারা দিনাজপুর যায়নি। প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে চট্টগ্রামের দিকেই।'

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এত সব খবর কুয়াশা জানছে কিভাবে? এইসব খবরের সূত্র কি? শহীদ কিন্তু অবাক হলো না। ও চেয়ে আছে কুয়াশার হাতের বড় আকারের হাত ঘড়িটার দিকে।

ভোর চারটের সময় ফোন এল ডি. কস্টার, 'হেলিকপ্টার রেডি ফর টেকঅফ, হাপনারা সবাই পাঁচ নম্বরে চলিয়া আসুন।'

একঘণ্টার মধ্যে 'কপ্টার ওদের সকলকে নিয়ে আকাশে উড়ল। কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাস্তায়, দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিক কুয়াশার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য হোটেলের সামনে ভিড় করলেও পুলিস তাদের কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। ছদ্মবেশ নিয়ে হোটেল ত্যাগ করে ওরা একটি মাইক্রোবাসে চড়ে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তাদেরকে কর্তৃপক্ষ জানায় হোটেলের স্টাফরা নাইট-ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

ওদের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়।

ভোর সাড়ে চারটা। 'কপ্টারের সীটে বসে সবাই ঘুমে ঢুলছে। জেগে আছে শুধু কুয়াশা। সুটকেস খুলে ভিতরের রাসায়নিক দ্রব্যভর্তি বোতলগুলো নিয়ে আপন মনে কাজ করছে সে।

মিনিট বিশেক পর কুয়াশা যেন আপন মনেই চমকে উঠল।

শহীদের দিকে তাকাল সে। শহীদ চোখ বুজে ছিল, ঘুমায়নি। নড়ে চড়ে বসল সে। তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি, বলল, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা?'

মাথা নিচু করে কি যেন অনুভব করবার চেষ্টা করছে কুয়াশা। শহীদের কথার

উত্তরে কিছুই বলল না সে, যেন শুনতেই পায়নি ওর কথা।

শহীদের গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেছে কামালের। তার নড়াচড়ায় জেগে উঠেছে ওমেনা। ডি. কস্টাও চোখ মেলে সিধে হয়ে বসল। রাসেলের ঘুম আগেই ভেঙেছে।

হঠাৎ মুখ তুলল কুয়াশা। গম্ভীর থমথমে শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'দেরি হয়ে গেছে আমাদের। শেষ রক্ষা বোধহয় করা গেল না।'

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছে। কুয়াশার কথা কেউ যেন ধরতে পারছে না।

আবার মাথা নিচু করে চিন্তা করতে লাগল কুয়াশা, কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠল সে, 'মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে—কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে। সৈনিকদের প্রভাতকালীন প্যারেডের সময় ঘটনাটা ঘটে। পাঁচশো সোলজার প্যারেডে যোগ দেয়। রহস্যময় মৃত্যু আঘাত হেনেছে তাদের উপর। বেশির ভাগই নিহত হয়েছে। বেঁচেছে মাত্র অল্প কয়েকজন।'

সবাই নিশ্চুপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। শত্রুরা আবার ছোবল মেরেছে, কেড়ে নিয়েছে প্রায় পাঁচশো সেনার প্রাণ।

আগুন ধরে গেছে যেন ওদের প্রত্যেকের শরীরে। শত্রুদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতেই হবে। তা না হলে শান্তি পাবে না ওরা।

ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করল কুয়াশা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে। অপারেটরের মুখ থেকে প্রায় সব তথ্যই পাওয়া গেল।

বলাই বাহুল্য, কড়া প্রহরা ছিল প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারদিকে। কোন সিভিলিয়ান উপস্থিত ছিল না সেখানে।

আর্মি অফিসাররা দুর্ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এবারের প্যারেডে স্মোক-স্ক্রীন বা আর কিছুর পরীক্ষা হচ্ছিল না। সামরিক বিভাগের বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করে দুর্ঘটনার কারণ বলতে না পারলেও তারা একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে আক্রমণটা পূর্ব পরিকল্পিত এবং শত্রুপক্ষ সেনাদেরকে হত্যা করার জন্যই আক্রমণ পরিচালনা করেছে। তাদের ধারণা, কোন এক ধরনের লাঙ-প্যারালাইজার মেশিন ব্যবহার করেছে শত্রুরা। নিক্ষিপ্ত রশ্মি বা আলোক-বিন্দুর প্রভাব এমনই যে উপস্থিত প্রত্যেকের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আচমকা বন্ধ করে দিতে পারে।

অল্প যে ক'জন সেনা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে তাদেরকে অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট-এর সাহায্যে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে।

কুয়াশা অপারেটরের কাছ থেকে প্রায় সব তথ্য পেলেও তাকে কেমন যেন অসন্তুষ্ট মনে হলো। অপারেটরকে নির্দেশ দিল সে, 'প্যারেড পরিচালনা করছিল কে তা জানো?'

'মেজর সালেক, মি. কুয়াশা।'

কুয়াশা বলল, 'তাকে খবর দাও। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।'

কয়েক মিনিট পরই মেজর সালেকের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মি. কুয়াশা?

আমি মেজর সালেক বলছি। আপনার অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট সাকসেসফুল। সেন্ট পার্সেন্ট। কিন্তু কথাটা আমরা প্রকাশ করছি না। কাউকে জানানো হয়নি। এমনকি ক্যান্টনমেন্টের কয়েকজন অফিসার ছাড়া কেউ জানে না আসল ঘটনা।'

কুয়াশা বলল, 'গুড। ঠিক আছে।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল কুয়াশা।

সবাই একযোগে প্রশ্ন করে উঠল। 'কি ব্যাপার? অক্সিজেন ট্রিটমেন্ট মানে?'

কুয়াশাকে শান্ত, দুশ্চিন্তামুক্ত দেখাচ্ছে। বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয়নি। ব্যাপার কি জানো, আমি প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে অক্সিজেন ক্যাপসুল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সেনারা যখন একত্রিত হয়ে কোন কাজে যাবে তখন যেন তাদের প্রত্যেককে একটা করে ক্যাপসুল খাইয়ে দেয়া হয়। প্যারেডে যারা যোগ দিয়েছিল তারা খেয়েছিল একটা করে ক্যাপসুল, ফলে কেউ মরেনি। কিন্তু কথাটা চেপে রাখা হবে, যাতে শত্রুপক্ষ ধরে নেয় যে তাদের অস্ত্র ব্যর্থ হয়নি।'

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে।

চট্টগ্রামে পুরো একটা দিন কাটিয়ে পরদিন প্লেনে চড়ে কক্সবাজারে পৌঁছেছে শফিকুল কবীর। সরকারী গোয়েন্দা হেলাল আহমেদ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে যাচ্ছে।

বিমান বন্দর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে শফিকুল কবীর। অপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করছে হেলাল আহমেদ।

রাস্তার মাঝখানে ট্যাক্সি থেকে নামল শফিকুল কবীর। পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে সে। হাঁটার ভঙ্গিতে কোন তাড়াহুড়ো বা চাঞ্চল্য নেই। হেলাল আহমেদকে সে সন্দেহ করেছে বলে মনে হচ্ছে না।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে শফিকুল কবীরকে অনুসরণ করে যাচ্ছে হেলাল আহমেদ।

শহরের সবচেয়ে বড় হোটেলে প্রবেশ করল শফিকুল কবীর। হেলাল আহমেদ লক্ষ করল হোটেলের খাতায় নাম না লিখিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল সে। অর্থাৎ হোটেলের রুম আগেই তার জন্য রিজার্ভ করা ছিল।

হেলাল আহমেদ লবির এক কোণায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা দৈনিক পত্রিকা সামনে মেলে ধরল সে। পত্রিকার আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

তিনতলায় নিজের রুমে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল শফিকুল কবীর। শার্টের বুক পকেট থেকে বের করল সে চেন দিয়ে বাঁধা ঘড়িটা। দম দেবার কাঁটাটা ঘোরাল সে। ঘড়িটা বাঁ হাতের তালুর উপর চিৎ করে রেখে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। হাতের তালুর উপর ঘড়িটা সেই একইভাবে পড়ে আছে। আরও খানিক পর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল তার। ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে আপন মনে। তিক্ত হাসি ফুটল মুখে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো, কিছু একটা

আবিষ্কার করতে পেরেছে সে।

এরপর কুয়াশার আলখেল্লার ভিতরের পকেট থেকে চুরি করা একটা বোতল এবং স্বাভাবিক আকারের চেয়ে একটু বড় একটা চুরুট বের করল সে নিজের কোটের পকেট থেকে। জিনিস দুটো অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে। কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেলল সে বোতলটা। চুরুটটা রাখল পকেটে, যেমন আগে ছিল। মূলত এই চুরুটের জন্যই গিয়েছিল সে কুয়াশার কাছে। এই চুরুটটা চুরি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। ওটা আসলে চুরুটের মত দেখতে হলেও চুরুট নয়। ওটা একটা মারণাস্ত্র। মুখে পুরে ফুঁ দিলেই ছোট্ট একটা বুলেট তীরবেগে বেরিয়ে সামনের লোককে আঘাত করবে—আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। বুলেটটায় বিষ মাখানো আছে।

শফিকুল কবীর এরপর পোশাক বদলাল। ছদ্মবেশ নিল সে। মিনিট বিশেক পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল। নিজেকে নিজেই চিনতে পারছে না সে—এতই নিখুঁত হয়েছে ছদ্মবেশ।

উপর থেকে নিচের লবিতে নামল শফিকুল কবীর আধঘণ্টা পর।

হেলাল আহমেদ প্রথমে তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। লোকটাকে শফিকুল কবীর বলে মনে না হলেও একটি জিনিস তার নজর এড়াল না। লোকটার বুক পকেটে সরু একটা সোনার চেন দেখা যাচ্ছে। পকেট ওয়াচের চেন ওটা। শফিকুল কবীরের পকেটে একটা পকেট ওয়াচ ছিল—সেটার চেনও ওই রকম—সোনার।

সন্দেহ হওয়াতে লোকটার দিক থেকে চোখ সরাল না হেলাল আহমেদ। শফিকুল কবীর ছদ্মবেশ নিলে কি হবে, তার হাঁটার ভঙ্গি বিশেষ বদলায়নি। লবি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। হেলাল আহমেদ তাকে অনুসরণ করবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

অন্য ধরনের একটা সন্দেহ উদয় হলো হেলাল আহমেদের মনে। কোন সন্দেহ নেই এখন আর যে শফিকুল কবীর জেনে ফেলেছে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ছদ্মবেশ নেয়া সত্ত্বেও ঘড়ির চেনটা লুকায়নি কেন সে?

সে কি চায় তাকে অনুসরণ করা হোক? হেলাল আহমেদের জন্য সে কি কোন ফাঁদ পাতার কথা ভেবেছে? নাকি ভুলক্রমে চেনটা লুকায়নি?

সন্দেহটা মনে উদয় হলেও অনুসরণে পিছপা হলো না হেলাল আহমেদ।

ট্যাক্সি নিল শফিকুল কবীর। কাছেপিঠে আর মাত্র একটি ট্যাক্সি ছিল। সেদিকে এগিয়ে গেল হেলাল আহমেদ। ড্রাইভার নিচে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে দিল। কিন্তু পিছনের সীটে উঠল না হেলাল আহমেদ, উঠল সে সামনের দরজা দিয়ে। বসল ড্রাইভারের পাশে। ট্যাক্সি পৌঁছুল বিমানবন্দরে। আধঘণ্টা পর একটা প্লেন ল্যাণ্ড করল রানওয়েতে। প্লেন থামল। দেখা গেল সাঈদা শরমিন নেমে আসছে নিচে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে।

সাঈদা শরমিনকে খুবই কাহিল এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। রানওয়ে থেকে বেরিয়ে এল সে। শফিকুল কবীরকে দেখতে পেল। থমকে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত পায়ে

এগিয়ে আসতে লাগল।

সাঈদা শরমিনের সাথে শফিকুল কবীর এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে অনুসরণ করল হেলাল আহমেদ।

শফিকুল কবীর এবং সাঈদা শরমিন কথা বলতে বলতে একটা ট্যাক্সিতে উঠছে। হেলাল আহমেদ যে ট্যাক্সিতে চড়ে বিমানবন্দরে এসেছিল সেটার দিকে এগিয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে চড়ে বসল সে দ্রুত।

শফিকুল কবীরদের ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করেছে।

হেলাল আহমেদের ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। এমন সময় বিপদটা টের পেল হেলাল আহমেদ। ট্যাক্সিতে ড্রাইভার ছাড়াও আরও দু'জন লোক রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে ওঠার সময় এদেরকে দেখেনি সে। লোক দু'জন মাথা নিচু করে বসে ছিল পিছনের সীটে।

'চেঁচালে কোন লাভ নেই।' একজন লোক শাসিয়ে বলে উঠল। লোক দু'জনের হাতে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। তীরবেগে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে গাড়িটা বিমানবন্দরকে পিছনে রেখে।

হেলাল আহমেদ লক্ষ করল বিমানবন্দরে যে ড্রাইভার তাকে নিয়ে এসেছিল তার বদলে অন্য একজন ট্যাক্সি চালাচ্ছে। রহস্যটা তেমন জটিল বলে মনে হলো না। শফিকুল কবীর জেনে ফেলেছিল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। হোটেলে নিজের রুম থেকে সম্ভবত টেলিফোনের মাধ্যমে তার সহকারীদের নির্দেশ দেয় সে। তার সহকারীরা সুযোগ বুঝে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মারধর করে বা অন্য কোন উপায়ে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা ফাঁদ পেতে বসেছিল ভিতরে। এরা যে শফিকুল কবীরের লোক তার প্রমাণ—দু'জনের হাতেই বড় আকারের দুটো হাতঘড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

হেলাল আহমেদকে সার্চ করা হলো। কেড়ে নেয়া হলো তার রিভলবার।

শহর ছাড়িয়ে ছুটে চলল ট্যাক্সি। দু'পাশে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি। ঢিবির উপর জঙ্গল। প্রায় নির্জন রাস্তা। কয়েকবার বাঁক নিল ট্যাক্সি।

পাকা রাস্তা ছেড়ে মেটো পথ ধরে মিনিট দশেক এগোবার পর একটা পাকা বাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। আশেপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই বলে মনে হলো।

আগেই কি করতে হবে ভেবে রেখেছিল হেলাল আহমেদ। শত্রুদের উদ্দেশ্য ভাল না, বুঝতে পেরেছে সে শত্রুদের মুখের চেহারা দেখেই। তাকে যে খুন করার জন্যেই এত দূরে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ট্যাক্সি থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে নামানো হলো হেলাল আহমেদকে।

নামল হেলাল আহমেদ। একজন লোক আগেই নেমেছে, এবার দ্বিতীয় লোকটা নামল। ড্রাইভার ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিল, চলে গেল ট্যাক্সি।

'হাঁটো, গোয়েন্দা সাহেব! কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা কোরো না—যদি আরও কিছুক্ষণ বাঁচতে চাও।'

ঠিক সেই সময় হেলাল আহমেদের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সামনের লোকটার উপর।

উদ্দেশ্য সফল হলো হেলাল আহমেদের। পিছনের লোকটা গুলি করবে না, ধরে নিয়েছিল সে। গুলি করলে নিজের দলের লোকের গায়েও লাগতে পারে।

সামনের লোকটা এতটা ভাবেনি। আক্রান্ত হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। হেলাল আহমেদ তার হাত থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রিভলবারটা। তাল সামলে পিছন দিকে গুলি করতে কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলো তার।

এই দেরিটাই হলো তার জন্য কাল। পিছনের লোকটা গুলি করল এবার।

হেলাল আহমেদের মাথার পাশে লাগল গুলি। মাথার অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল উত্তপ্ত বুলেট মগজের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে।

পড়ে গেল দেহটা। এতটুকু নড়ল না। বুলেট বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে বেচারা হেলাল আহমেদের।

'টিকটিকি মেরে মজা নেই।' নিজের হাতের রিভলবারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল খুনী লোকটা, 'শয়তান কুয়াশাকে এভাবে গুলি করে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমাদের।'

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের গেটের সামনে থামল ওদের গাড়ি। গাড়ি থেকে ওরা নামার আগেই অপেক্ষমাণ দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের দল চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল কুয়াশা, পিছন পিছন শহীদ। অপর দরজা দিয়ে নামল রাজকুমারী, কামাল, ডি. কস্টা এবং রাসেল।

সাংবাদিকের দল প্রশ্ন করতে লাগল চারদিক থেকে। হাজারটা প্রশ্ন তাদের।

কুয়াশা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ খুলল সে, 'আপনাদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব আমি। তবে এক শর্তে। শর্তটা হলো, আমাদের কাউকে অনুসরণ করবেন না আপনারা। তাতে আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।'

সাংবাদিকরা শর্ত পূরণ করতে রাজি হলো।

ফটোগ্রাফাররা কুয়াশার ছবি তুলছে চারদিক থেকে। সাংবাদিকরা একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে।

কুয়াশা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। শেষে বলল, 'আসলে মৃত্যুরশ্মি সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও আমি নিজেই জানতে পারিনি। শত্রু কারা, এ প্রশ্নের উত্তরও আমার পক্ষে এই মুহূর্তে দেয়া সম্ভব নয়। তবে কথা দিচ্ছি, আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য যথাসময়ে আমি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকব—সব রহস্য ব্যাখ্যা করে বলব তখন।'

একজন সাংবাদিক জানতে চাইল, 'আচ্ছা, মি. কুয়াশা, এই রহস্যের সাথে একটি সুন্দরী মেয়ে জড়িত বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে—কথাটা কতদূর সত্যি?'

প্রশ্নটা করে রিপোর্টার ভিড় ঠেলে কুয়াশার একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

'আপনি এ-ব্যাপারে বরং রাজকুমারী ওমেনাকে জিজ্ঞেস করুন।'

কুয়াশার কথা শুনে সকলে তাকাল রাজকুমারী ওমেনার দিকে। পরমুহূর্তে হাজারটা প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হলো রাজকুমারীর উদ্দেশে। রাজকুমারী, আপনি আপনার গ্রহ আনতারায় ফিরে যাবার কথা ভাবছেন কিনা? রাজকুমারী, আপনি কি মহামানব মি. কুয়াশাকে বিয়ে করবেন? রাজকুমারী, আমাদের পৃথিবী কেমন লাগছে আপনার? রাজকুমারী, আপনার গ্রহের মানুষের কি বয়স বাড়ে না, তারা কি অমর? রাজকুমারী, আপনার সাথে মি. কুয়াশার সম্পর্ক ঠিক কি ধরনের বলবেন কি? এমনি হরেক রকম প্রশ্ন।

'চুপ করুন।' রাজকুমারী বলে উঠল।

চুপ করল সবাই।

রাজকুমারী বলল, 'আমি মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দেব। তাও দেব একটি শর্তে। শর্তটা হলো আর কোন প্রশ্নের উত্তর চাইতে পারবেন না কেউ। আপনাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমি। না, এই রহস্যের সঙ্গে কোন মেয়ে জড়িত নেই।'

রাজকুমারীর কথা শেষ হতেই কুয়াশা বলে উঠল, 'আপাতত এখানেই শেষ করুন আপনারা।'

গেট পেরিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতর ঢুকল ওরা।

সাংবাদিকরা তাদের গাড়ির দিকে ছুটল। গাড়িগুলো স্টার্ট নিয়ে সবেগে ছুটে চলল পত্রিকা অফিসের দিকে।

কিন্তু একটি গাড়ি পত্রিকা অফিসের দিকে না গিয়ে ছুটল প্রধান পোস্ট অফিসের দিকে। পোস্ট অফিসে গিয়ে ফোন করল সাংবাদিক এবার নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে। অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর, দেওজী কাংকারিয়ার কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো!'

সাংবাদিকের ছদ্মবেশধারী দেওজী কাংকারিয়ার অনুচর উত্তেজিত ভাবে বলল, 'রহস্যটা জানতে পেরেছি, বস্। শয়তান কুয়াশা আমাদের সব খবর কি ভাবে জেনে ফেলছে আগেভাগে আমি তা ধরতে পেরেছি। তার হাতে আমাদেরই একটা হাতঘড়ি দেখেছি আমি…!'

চার

প্রথম থেকেই কুয়াশা বুঝতে পেরেছিল বড় আকারের হাত ঘড়িগুলোর বিশেষ একটা ভূমিকা আছে এই রহস্যে। আইনজ্ঞ মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ে খণ্ডযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের একজনের একটা হাতঘড়ি হস্তগত করে সে—ঘড়িটা পরীক্ষা করে আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলে।

হাতঘড়িটা আসলে কোন ঘড়িই নয়—এটা একটা মিনি সাইজের ওয়্যারলেস সেট। তবে অন্যান্য মিনি ওয়্যারলেস সেটের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য আছে। এটার সাহায্যে মেসেজ রিসিভ করা যায় কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করেই। গায়ে গা ঠেকিয়ে কোন লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও সে টের পাবে না মেসেজ আসছে। কোন কোনটা আবার মেসেজ রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ ট্র্যান্সমিট

করার ক্ষমতাও রাখে। কুয়াশা যেটা পেয়েছিল সেটা অবশ্য শুধুই রিসিভ করতে পারে—ট্র্যান্সমিট করতে পারে না।

সিগন্যাল আসে ঘড়ির পিছন দিককার গায়ে, উত্তাপ রূপে। কন্টিনেন্টাল কোড যাদের জানা আছে তারা এই উত্তাপ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যালের অর্থ অনুধাবন করতে পারবে অনায়াসে।

হাতঘড়িটা হাতে পরার পর কুয়াশা আরও জানতে পারে যে, সাইফার কোড ব্যবহার করা হয় কদাচ, শুধু অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ পাঠাবার দরকার হলে। সেক্ষেত্রে, স্বভাবতই, সাইফার কোডকে নিয়মানুযায়ী ভেঙে মেসেজের প্রকৃত অর্থ বের করে নিতে হয়। কুয়াশার বেলায় অবশ্য তার দরকার হয় না। অসাধারণ স্মরণ-শক্তি ও মেধা তার। সাইফার কোডকে অনুবাদ করে মেসেজ উদ্ধার করার কাজটা সে সিগন্যাল পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সারতে পারে।

এই ধরনের অর্থাৎ সাইফার কোডে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল শফিকুল কবীর। কুয়াশা মেসেজটা রিসিভ করে। সরকারী গোয়েন্দা হেলাল আহমেদকে খুন করার জন্য শফিকুল কবীর তার দুই অনুচরকে নির্দেশ দেয় সেই মেসেজে। কুয়াশা মেসেজটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট পুলিসকে এ ব্যাপারে সতর্ক হবার নির্দেশ দেয়।

হাতঘড়িটা খুলে পরীক্ষা করার পর আরও অনেক তথ্য জানতে পেরেছে কুয়াশা। ঘড়িগুলো আসলে হাইলি সেনসিটিভ, জটিল রেডিও রিসিভার।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই রিসিভার সাধারণ রেডিও ওয়েভ রিসিভ করে না।

ঘড়িটা তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে যাতে শুধুমাত্র মাইক্রোসকোপিক ওয়েভ রিসিভ করতে পারে এটা। এই ধরনের মাইক্রোসকোপিক ওয়েভ কমিউনিকেশনের প্রয়োজনে আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি।

ইনফ্রা-রে প্রকৃতপক্ষে কল্পনাতীত ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ ধারণে সক্ষম, এটা এতদিন তত্ত্বের মধ্যেই সীমিত ছিল—কেউ এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু শত্রুপক্ষ পেরেছে। শত্রুপক্ষের ক্ষমতা কতটুকু এ থেকে তা খানিকটা অনুমান করা যায়। শত্রুপক্ষে যে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আছে তাতে কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

মোখলেসুর রহমান রঙিন কাঁচের চশমা পরে ছিল বলে পাশের বিল্ডিং থেকে ট্র্যান্সমিটরত আলোক সঙ্কেত দেখতে পেয়েছিল। যারা ওই বড় আকারের হাতঘড়ি পরেছিল তারা অনুভব করেছিল সিগন্যালগুলো—চোখে দেখেনি।

শফিকুল কবীর এবং সাঈদা শরমিনকে নিয়ে ট্যাক্সি অবশেষে গিয়ে থামল শহর থেকে অনেক দূরে, একটা প্রকাণ্ড বাগান বাড়ির ভিতর।

হলরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল স্বয়ং দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকা। দু'জনেই হাসছে।

ওদের হাসি দেখে থমকে দাঁড়াল শফিকুল কবীর এবং সাঈদা শরমিন। কেমন যেন ব্যঙ্গাত্মক হাসি।

প্রবেশ পথ থেকে সরে দাঁড়াল দু'জন। ওরা হলরুমে প্রবেশ করল। দেওজী এবং সান্তারামের পরনে দামী স্যুট। দু'জনের হাতেই জ্বলন্ত সিগার। তারাও ভিতরে ঢুকল। সান্তারাম বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর, হঠাৎ, দু'জনই পকেট থেকে দুটো লোডেড রিভলবার বের করল।

পাংশুবর্ণ ধারণ করল শফিকুল কবীরের মুখের চেহারা। তোতলাতে শুরু করল সে ভয়ে, 'কি ব্যা-ব্যাপার! এ-এ-এসব কি! আমি ভে-ভেবে ছি-ছিলাম আ-আপনারা সাঈদ চৌ-চৌধুরীর বন্ধু···আ-আমরা তা-তার সঙ্গে দে-দে-দেখা করতে এসেছি···!'

সান্তারাম উলকা আচমকা রিভলবার ধরা হাতটা শফিকুল কবীরের মাথার উপর তুলেই বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনল। রিভলবারের ভারী নলটা শফিকুল কবীরের মাথার মাঝখানে আঘাত হানল।

কেঁপে উঠল শফিকুল কবীর। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধের মত হাতড়াতে লাগল সে কিছু একটা ধরার জন্য। তারপর পড়ে গেল মেঝেতে। নিঃসাড় হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে দেহটা। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

'এ কি! তোমরা ভেবেছ কি···!' সাঈদা শরমিন রাগে ঠকঠক করে কাঁপছে।

'থামুন, মিস শরমিন। আগে সব কথা শুনুন আমাদের—তারপর যা হয় ব-বেন।' সান্তারাম উলকা কথাগুলো বলে তাকাল দেওজীর দিকে।

দেওজী কাংকারিয়া শুরু করল, 'শফিকুল কবীর আপনার বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মিস শরমিন। সে শয়তান কুয়াশার সঙ্গে দেখা করে তাকে জানিয়ে এসেছে যে রহস্যময় হত্যাযজ্ঞের পিছনে আপনার বাবাই হলো আসল কালপ্রিট।'

'কি!'

দেওজী কাংকারিয়া গম্ভীর হলো। বলল, 'হ্যাঁ। শফিকুল কবীর জঘন্য, হীন চরিত্রের লোক। সে এ কাজ করায় আমি এতটুকু আশ্চর্য হইনি। যাক, ও যা করেছে তার জন্যে মন খারাপ করলে লাভ হবে না। আমাদের সামনে এখন মস্ত বড় বিপদ দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনার বাবাকে রক্ষা করতে হবে কুয়াশার হাত থেকে। কিন্তু কি উপায়ে তা সম্ভব ভেবেই পাচ্ছি না আমি। তবে একটা কথা ভাবছিলাম খানিক আগে। আপনি, মিস শরমিন, ইচ্ছা করলে একটা উপায় করতে পারেন। কিন্তু তা করবেন কিনা, করতে পারবেন কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন। মনে রাখবেন, সমস্যাটা আপনার বাবাকে নিয়ে। তাঁর জীবন-মরণ নিয়ে।'

কি যেন ভাবল সাঈদা শরমিন। দৃঢ় গলায় তারপর জানতে চাইল সে, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'শুনুন তাহলে···।'

বলতে শুরু করল দেওজী কাংকারিয়া।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠকে বসল ওরা। সেক্রেটারি সাহেব সবিস্তারে গত ভোরের মর্মান্তিক ঘটনার কথা বললেন। ভদ্রলোকের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সামরিক বাহিনীর এই বিপদে নিজেকে শান্ত

রাখা কোন দেশ-প্রেমিক বাংলাদেশীর পক্ষেই সম্ভব নয়। প্যারেডে যে একজন সেনাও মারা যায়নি, সে-কথা এমন কি তিনিও জানেন না।

কামাল প্রশ্ন করল, 'কোন ক্লু পাওয়া যায়নি সার্চ করার পরও?'

'অনুসন্ধানকারীরা একটা মাত্র ক্লু পেয়েছে। সেটা তেমন কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না। প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে বেশ খানিকটা দূরে, কিছু লোকের পায়ের দাগ পাওয়া গেছে। দেখে মনে হয় কিছু লোক জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল। সামরিক বাহিনীর কোন লোকের ওদিকে যাবার কথা নয়। ওখান থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ড দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মৃত্যু-রশ্মির মেশিনটা ওখানে রাখা হয়েছিল, ওখান থেকেই সেটাকে পরিচালনা করা হয়েছে।'

অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। বলল, 'আমরা আশা করি এই রহস্যের সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হবে। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পেলে জানাব আপনাকে। এই মুহূর্তে বিদায় নেই আমরা।'

সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে। দীর্ঘ পদক্ষেপে সিটিং রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। দেরি না করে সবাই তাকে অনুসরণ করল।

বাইরে বেরিয়ে এসে জীপে উঠল ওরা। কুয়াশার পাশে বসল শহীদ। জানতে চাইল ও, 'ব্যাপার কি, কুয়াশা?'

'সাঈদা শরমিন তার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছে।'

রাজকুমারী প্রশ্ন করল, 'মেয়েটা কি সত্যিই এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত?'

'ওর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তথ্য আছে।' বলল কুয়াশা। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে। তীরবেগে ছুটতে লাগল সামরিক বাহিনীর জীপ।

'কক্সবাজারের ঠিক কোথায় যাচ্ছে সে?'

'কর্ণেলিয়াস পার্কে অপেক্ষা করবে সে। এদিকে দেওজী কাংকারিয়ার লোকেরা তাকে বন্দী করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এখন থেকে ঠিক দুই ঘণ্টা পর সাঈদা শরমিন পার্কে পৌঁছুবে। দেওজী কাংকারিয়ার লোকেরা আগে থেকেই লুকিয়ে থাকবে পার্কে।'

শহীদ বলল, 'তার মানে আমাদেরকে দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুতে হবে পার্কে।'

'রাস্তায় কোন বিপদ না ঘটলে একশো মাইল দুই ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করতে পারব।'

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাবার রাস্তাটা তেমন ভাল নয়। আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাকা রাস্তার মাঝখানে ছোট বড় হাজার হাজার গর্ত। জীপের স্পীড প্রায়ই কমাতে হচ্ছে।

তবু চেষ্টার বিরাম নেই কুয়াশার। সময় থাকতে পৌঁছুতেই হবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

দু'ঘণ্টা কেটে গেল। কক্সবাজারে পৌঁছে গেছে ওরা। কর্ণেলিয়াস পার্ক আর মাত্র আধমাইল দূরে।

কয়েক মিনিট পর পার্কের গেট দেখতে পেল ওরা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা, 'কালো মরিস! কালো মরিস! মি. কুয়াশা, এনিমিডের কার উহা—ফর গডস সেক।'

সত্যিই তাই। পার্কের ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে একটা কালো মরিস বেরিয়ে এসে বাঁক নিয়ে সোজা ছুটে চলেছে পুব দিকে।

জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল কুয়াশা।

মরিসের ভিতর সাঈদা শরমিনকে দেখা যাচ্ছে। দু'জন লোক তাকে চেপে ধরে রেখেছে। হাত-পা ছুঁড়ছে সে।

শত্রুরা এখনও টের পায়নি তাদেরকে একটা জীপ অনুসরণ করছে। কিন্তু তবু গাড়ির স্পীড ক্রমশ বাড়ছে তাদের। দ্রুত শহর ছাড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে মরিস।

'মার্সি পিস্তল!'

কুয়াশা শব্দ দুটো উচ্চারণ করতেই শহীদ এবং ডি. কস্টার পকেট থেকে বেরিয়ে এল বড় আকারের দুটো পিস্তল। ঠিক সেই সময় সামনের মরিস বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের আড়ালে।

কয়েক মুহূর্ত পরই বাঁক নিল জীপ। আবার দেখা যাচ্ছে মরিসকে। মেটো পথ। সামনে পাহাড়ের মত সুউচ্চ ধুলোর দেয়াল উঠল। দেখা যাচ্ছে না আর মরিসকে—ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে সেটা।

ধুলোর দেয়ালের ভিতর দিয়েই চালিয়ে দিল কুয়াশা জীপটাকে। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অচেনা রাস্তা। কোথায় বাঁক, কোথায় ঢিবি, কোথায় খাদ—কিছুই জানা নেই।

মেটো পথ ধরে কয়েক মুহূর্ত ছুটল জীপ। ধুলোর পাহাড় মিলিয়ে গেছে সামনে থেকে। সামনের রাস্তাটা ফাঁকা, নির্জন, যানবাহন শূন্য দেখা যাচ্ছে। মরিসটার ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। যাদুমন্ত্রের মত সামনে থেকে গাড়িটা যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ব্রেক করল কুয়াশা। টায়ারের শব্দ হলো। তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ।

পথের দু'পাশে উঁচু ঢিবি। ঢিবিগুলোর মাঝখানে ছোট একটা মাঠ। সেই মাঠের উপর গাড়ির চাকার দাগ।

ঘাসের উপর দিয়ে, দুই ঢিবির মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে মরিস।

জীপ থামতেই সবাই ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে নেমে পড়ল নিচে। পথের পাশে অনেক গাছ। গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল সবাই। প্রত্যেকের হাতে কুয়াশার দেয়া মার্সি পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

কুয়াশা উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল। কয়েক পা সামনে এগোবার পরই থমকে দাঁড়াল সে। একটি নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার চারদিকের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল।

সাঈদা শরমিনের গলা চিনতে ভুল হলো না কুয়াশার। ছুটল সে শব্দ লক্ষ্য করে। সবাই পিছু নিল তার।

ছোট্ট মাঠটা পেরিয়ে ওরা বাঁক নিল। একটা ঢিবির কিনারা ঘেঁষে খানিক দূর এগোবার পরই চোখে পড়ল মরিসটা। ঢিবির ভিতর দিকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সুড়ঙ্গ মুখটা প্রকাণ্ড হাঁ করে গিলতে আসছে যেন।

থমকে দাঁড়াল ওরা সবাই সুড়ঙ্গ মুখের সামনে। ভিতরে দৃষ্টি চলে না। গাঢ় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে ভিতরে।

'ফাঁদ নয় তো?' প্রশ্ন করল শহীদ। পরমুহূর্তে আবার সাঈদা শরমিনের আর্তনাদ ভেসে এল সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে।

এক মুহূর্তও ইতস্তত করল না কুয়াশা। লাফ দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করল সে। ফাঁদ হোক বা না হোক, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। একটি মেয়ের জীবন-মৃত্যু হয়তো নির্ভর করছে এর উপর—ফাঁদ মনে করে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বিশ গজের মত এগোল ওরা, তারপর একটা বাঁক। বাঁক নিতেই স্বল্প আলোর দেখা পাওয়া গেল। খুবই অবাক কাণ্ড বলে মনে হলো ব্যাপারটা, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলছে কেন?

কুয়াশা বলল, 'ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্য কিছু কিছু সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। পর্যটন কর্তৃপক্ষই আলোর ব্যবস্থা করেছিল।'

এগিয়ে চলল ওরা। খানিক দূর যাবার পরই সুড়ঙ্গটা চওড়া হয়ে গেছে। রীতিমত প্রশস্ত করিডরের মত জায়গাটা। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে চোখেমুখে। দেয়ালগুলোও সেঁতসেঁতে, ভিজে ভিজে।

'সুড়ঙ্গের অপর দিকে সম্ভবত নদী আছে,' কামাল মন্তব্য করল।

'সাগরের সঙ্গেও যোগ থাকতে পারে,' বলল রাসেল।

বৈদ্যুতিক আলোয় এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওদের। কিন্তু কুয়াশা পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করল দেখে শহীদ অবাক হয়ে কারণটা জিজ্ঞেস করতে গেল—কিন্তু কি ভেবে ক্ষান্ত হলো। কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। কারণ না থাকলে কুয়াশা কোন কাজ করে না।

আরও খানিক দূর যাবার পর সুড়ঙ্গের চৌমাথায় পৌঁছুল ওরা, ইতস্তত না করে ডান দিকের পথ ধরে এগোল কুয়াশা। ধুলোর উপর জুতোর দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সাঈদা শরমিনের চিৎকার সেই যে থেমেছে, আর শোনা যায়নি একবারও। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওরা—মেয়েটাকে শত্রুরা সুড়ঙ্গের অভ্যন্তর ভাগে টেনে নিয়ে গেছে। বলা যায় না, এতক্ষণে হয়তো মেরেই ফেলেছে তাকে।

সুড়ঙ্গটা সামনের দিকে আরও চওড়া হয়ে গেছে। একটা ইলেকট্রিক বালবের নিচে দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা—আচমকা অফ হয়ে গেল আলো।

গাঢ়, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে।

সামনে ছিল কুয়াশা এবং শহীদ। একযোগে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনের সবাই।

বাতাসে কেমন যেন একটা গন্ধ। কেউ কিছু বুঝবার আগেই টলে উঠল

প্রত্যেকের শরীর। বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে ওরা। সশব্দে পড়ে গেল সবাই প্রায় একসাথে। জ্ঞান নেই কারও।

পাঁচ

জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিরূপ হয়ে উঠল ওরা। মাথায় অসহ্য ব্যথা। পাঁজরে, কব্জিতে আর ঘাড়েও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল সবাই।

জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নার্ভ গ্যাসের গন্ধ পেল ওরা।

অনুভব করল, শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা ওদের হাত এবং পা।

কুয়াশার আলখেল্লার পকেট থেকে সব যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র বের করে নেয়া হয়েছে। আর সকলের পকেটও শূন্য। কুয়াশার হাতঘড়িটাও নেই।

আচমকা একটা কর্কশ, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঝট করে ওরা সবাই তাকাল উপর দিকে।

দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকা সুড়ঙ্গের উঁচু সিলিংয়ের ফাটল দিয়ে উঁকি মারছে। কথা বলছে কাংকারিয়া, 'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে! ভগবান! তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। এইবার সফল হয়েছি আমরা। সাক্ষাৎ যম এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের হাতের মুঠোয় পেয়েছি। আর দেরি নয়। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। ওহে মহামানব কুয়াশা—তুমি তো পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী! তোমার মত শক্তিশালী নাকি আর দ্বিতীয়টি নেই। পারবে আমার হাত থেকে বাঁচতে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এমন ফাঁদ পেতেছি যে স্বয়ং ভগবানও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যাই হোক, তোমার বীরত্বের অনেক কাহিনী শুনেছি—একজন বীরপুরুষ কিভাবে মরে তা দেখার সাধ মিটবে আজ আমার—এখনই! সান্তারাম, ফাটাও তোমার ডিনামাইট!'

এক, দুই, তিন—চার সেকেণ্ড পর কানফাটানো শব্দ হলো বিস্ফোরণের। প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হলো যেন। থরথর করে কাঁপছে সুড়ঙ্গের দেয়াল, মেঝে এবং সিলিং। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই পানির প্রবাহের তীব্র শব্দ কানে ঢুকল ওদের।

ফিসফিস করে কথা বলে উঠল শহীদ, 'ডিনামাইট দিয়ে সুড়ঙ্গের দেয়াল উড়িয়ে দিয়েছে! সাগরের পানি ঢুকছে সুড়ঙ্গে।'

'সলিল সমাধি লাভ করবে তোমরা!' উপর থেকে সহাস্যে বলে উঠল কাংকারিয়া, 'কেউ তোমাদেরকে আর রক্ষা করতে পারবে না।'

কাংকারিয়ার কথা ওদের কারও কানে ঢুকল না। সুড়ঙ্গের ভিতর তীব্র বেগে নোনা পানি ঢুকছে। দ্রুত বাড়ছে পানি। ডুবে যাচ্ছে ওদের হাঁটু, কোমর, বুক, গলা।

দেখতে দেখতে পানির উচ্চতা ওদের মাথা ছাড়িয়ে গেল। ডুবে গেল কুয়াশা, শহীদ, রাজকুমারী, কামাল, ডি. কস্টা এবং রাসেল।

দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকা উপর থেকে দেখছে। অনেকক্ষণ

তাকিয়ে রইল তারা। পানির উপর কোন আলোড়ন নেই দেখে কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। কুয়াশা এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা সলিল সমাধি লাভ করেছে।

'শত্রুর বংশ ধ্বংস করে দিয়েছি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল কাংকারিয়া।

সুড়ঙ্গের উপরের ছাতে দেওজী এবং সান্তারামের সঙ্গে মিলিত হলো আরও একজন লোক। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এই লোকই শফিকুল কবীর।

প্রৌঢ় শফিকুল কবীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছে। আটাশ বছরের দোহারা গড়নের যুবক সে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

'যাই বলুন, অত জোরে আমাকে মারা আপনাদের উচিত হয়নি।'

'আর কোন উপায় ছিল, বলুন? মেয়েটাকে বোঝাবার দরকার ছিল যেন আমি অভিনয় করছি না। যা হবার হয়েছে—ভুলে যান। শয়তান কুয়াশা আর তার দলবল খতম হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পথ এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তী কাজ আমাদের কি বলুন তো? কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের ফরমুলাটা উদ্ধার করা। তার আগে আপনি বলুন, কুয়াশার কাছ থেকে সেই জিনিসটা আনতে পেরেছেন কিনা?'

'বাহ্! গিয়েছিলামই তো ওটা আনতে। সুযোগ পেয়ে কুয়াশাকে খুন করারও চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু পারিনি। তবে জিনিসটা এনেছি।'

পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা বোতল বের করল শফিকুল কবীর। বলল, 'এই হলো সেই জিনিস।'

কাংকারিয়া কাগজের আবরণ থেকে বোতলটা মুক্ত করল। বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে—'ট্রুথ সেরাম'।

ভিতরে লালচে তরল রাসায়নিক দ্রব্য। এই রাসায়নিক দ্রব্য কারও শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়। যে প্রশ্ন করা হবে, ওষুধ গ্রহণকারী ব্যক্তি সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে বাধ্য। চেষ্টা করেও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না সে।

ছাদের শেষ মাথায় পৌঁছে একটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ওরা তিনজন। কথা বলতে বলতে দ্রুত হাঁটছে ওরা।

'সমস্যাগুলো কেটে গেছে এক এক করে সব। আর কয়েকটা কাজ নির্বিঘ্নে সারতে পারলেই হয় এখন।'

সান্তারাম মন্তব্য করল, 'পরবর্তী পদক্ষেপ খুব সতর্কতার সঙ্গে ফেলতে হবে। যাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে যাচ্ছি আমরা তারা সুযোগ পেলে বেঈমানী করার চেষ্টা করবে—তাই না?'

সুড়ঙ্গের শেষে একটি দরজা। দরজা খোলা। ভিতরে ছোট্ট একটা কামরা। সেই কামরায় প্রবেশ করল ওরা।

'সর্বনাশ! পালিয়েছে!' দাঁতে দাঁত চাপল কাংকারিয়া।

শফিকুল কবীর হাসল। বলল, 'কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। সাঈদা খুব ভাল করেই জানে তার বাবার পজিশন কতখানি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেছে—মুখ

খোলার সাহস তার কোনদিনই হবে না। নিজেই সে আসবে ধরা দিতে। বাধ্য হবে।'

নিজেকে মুক্ত করলেও সাঈদা শরমিন কি করবে ভেবে পেল না। দিশেহারার মত ছুটতে ছুটতে একটা সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এসে সাগরের সামনে দাঁড়াল সে।

নির্জন বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত অশান্ত সাগরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে। সাগরের অশান্ত রূপ তাকে আরও অশান্ত করে তুলল। তীব্র বাতাসে তার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। হাতের ছোরাটা চোখের সামনে তুলে ধরল সে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। হঠাৎ চমকে উঠে পিছন দিকে তাকাল সে। দেওজী কাংকারিয়ার ভয়ে কেঁপে উঠল সে।

ধরা তাকে পড়তেই হবে। কাংকারিয়া ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিজের মানসম্ভ্রম বাঁচাবার কোন উপায় নেই—বুঝতে পারছে সে। শেষ আশা—কুয়াশার সাহায্য—তাও পাওয়া যাবে না আর। দেওজী কাংকারিয়ার মিথ্যে আশ্বাসে কুয়াশা আর তার বন্ধু-বান্ধবদের ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করেছে সে। মারা গেছে ওরা সবাই।

অনুশোচনায়, অনুতাপে, হতাশায় বিমূঢ় হয়ে পড়ল সাঈদা শরমিন। ছোরাটার দিকে আর একবার তাকাল সে। তারপর গলায় ঠেকাল ছোরার ধারাল ব্লেডটা···।

সাগরের অথৈ জলের নিচ থেকে একটা মাথা ভেসে উঠল।

ভেসে এল সাঈদা শরমিনের কানে একটি ভরাট কণ্ঠস্বর, 'আত্মহত্যা করা চরম বোকামি।'

চমকে উঠে সাঈদা শরমিন সাগরের দিকে তাকাল। হাতের ছোরাটা পড়ে গেল হাত থেকে। অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে আছে সে সাগরের দিকে।

সাগর থেকে তীরে উঠছে কুয়াশা। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে শহীদ, রাজকুমারী, কামাল, রাসেল ডি. কস্টাকে।

'আ-আপনারা বেঁচে আছেন!'

সহাস্যে সাঈদা শরমিনের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ব্যাখ্যা করল শহীদ, 'শয়তান দেওজী কাংকারিয়া ভেবেছিল কুয়াশার পকেটেই সব যন্ত্রপাতি থাকে—ওগুলো সরিয়ে নিয়ে সে ভেবেছিল কুয়াশার আর কিছু করার নেই। আসলে যন্ত্রপাতি কুয়াশার কাছে এরপরও ছিল। ফলস-স্কিন—অর্থাৎ কুয়াশার শরীরের চামড়ার সঙ্গে নকল চামড়ার পকেট ছিল—তাতে বেশকিছু যন্ত্রপাতিও ছিল; পানির নিচে আমরা ডুবে যেতেই কুয়াশা প্রত্যেককে একটা করে অক্সিজেন ক্যাপসুল খেতে দেয়। অক্সিজেন ক্যাপসুল খাবার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন ফুরোয় আমাদের। ফলস স্কিনের পকেটে ছুরিও ছিল। সেটা বের করে কুয়াশা নিজের এবং আমাদের হাত-পায়ের রশির বাঁধন কেটে দেয়।'

সাঈদা শরমিন শহীদের কথা শুনছিল না। ভয়ে কাঁপছিল সে। শহীদ থামতেই সে বলে উঠল, 'কিন্তু আমার কোন দোষ নেই, বিশ্বাস করুন। আমি স্বীকার করছি,

আপনাদেরকে ফাঁদে ফেলেছি আমিই···কিন্তু, বিশ্বাস করুন, দেওজীর নির্দেশে, আর কোন উপায় ছিল না বলে···বিশ্বাস করুন।···আমি চাইনি আপনারা বিপদে পড়ুন···।'

কুয়াশা শান্তভাবে বলল, 'আমরা জানি।'

'আ···আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন···?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে দুর্বল পেয়ে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে ব্যবহার করেছে। আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। যাক, আমরা তোমার সব কথা শুনতে চাই এবার।'

'অনেক কথা বলবার আছে আমার। কিন্তু আপনারা আমাকে আর আমার বাবাকে সাহায্য করবেন তো?'

'নির্দোষ মানুষকে সাহায্য করার জন্যে আমরা প্রস্তুত। তোমার বাবা যদি নির্দোষ হন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা সাহায্য করব।' কুয়াশা আশ্বাস দিয়ে বলল।

'কয়েক হপ্তা আগে ঘটনা ঘটতে শুরু করে।' সাঈদা শরমিন বলতে শুরু করল, 'আমার বাবা একজন বিজ্ঞানী। কেমিস্ট্রিতে তিনি একজন পণ্ডিত। কিছুদিন আগে বাবা এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেন যা যুগান্তকারী বলে বিশ্বাস করেন তিনি। আবিষ্কারের ফরমুলা নিয়ে যাতে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেজন্যে তিনি একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন···।'

'অ্যাডভোকেটের নাম মোখলেসুর রহমান, তাই না?' জানতে চাইল কুয়াশা।

সাঈদা শরমিন বলল, 'হ্যাঁ। শফিকুল কবীর আমার কাকা বটে, কিন্তু সে আমার বাবার সৎ-ভাই। ল্যাবরেটরিতে সে বাবার অ্যাসিস্টেন্ট ছিল। বাবার আবিষ্কার সম্পর্কে শুনলেও ভিতরের তথ্য তার জানার বাইরেই থেকে যায়।'

অনেক রহস্যের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে সাঈদা শরমিনের কথা শুনে। সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে তার কথা।

'অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমানের কাছে বাবা পৌঁছুতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। কথাটা আজই আমি জানতে পারি। বাবা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন—তার কোন সন্ধানই আমি পেলাম না। শফিকুল কাকা আমাকে বলল, বাবা নাকি নিরাপদেই আছে। কাকার কথা শুনে নিশ্চিন্তই ছিলাম আমি। কিন্তু তারপরই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দুশো সেনা নিহত হলো। হত্যাযজ্ঞ ঘটার খবর পেয়েই আমি বুঝলাম এই মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে বাবার আবিষ্কারের কোন না কোন যোগ আছে। বাবা আমাকে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে যতটুকু বলেছিলেন তাতে আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এক ধরনের কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড আবিষ্কার করেছেন তিনি, যার ক্ষমতা অসাধারণ।'

'বলে যাও।'

'ঢাকায় আমাদের একটা বাড়ি আছে। সে বাড়িতেই ছিলাম আমি। শফিকুল কাকা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাকে জানিয়েছিল সে ঢাকায় আসছে। তাকে রিসিভ

করার জন্যই এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম আমি। প্লেন থেকে কিন্তু নামতে দেখলাম না শফিকুল কাকাকে। এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে দেখি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাড়ির ড্রাইভারটা কাংকারিয়ার লোক। শফিকুল কাকার সঙ্গেও লোকটাকে একবার দেখেছিলাম। ওর কাছ থেকে খবরাখবর পাব মনে করে ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করি আমি। মাঝ পথে দেখি গাড়ির ড্রাইভার চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটতে শুরু করল। লোকটাকে কে খুন করে তা আমি বলতে পারব না। তবে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে আসার সময় তাকে আমি পড়ে থাকতে দেখি। লোকটাকে সাহায্য করার জন্যই সেদিকে এগোই আমি। সেই সময়ই আমার হাতের রুমালটা ওখানে কিভাবে জানি না পড়ে গিয়েছিল।'

'মোখলেসুর রহমানের অফিসে কেন গিয়েছিলে তুমি?' জানতে চাইল শহীদ।

'মোখলেসুর রহমানকে বাবা চিঠিপত্র লিখেছে কিনা খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম ওখানে। যতই সময় কাটছিল—আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম বাবার আবিষ্কারই ব্যবহার করা হয়েছে সেনাদের হত্যাযজ্ঞে। কিন্তু এ কথা কাউকে বলার উপায় ছিল না আমার। বাবার সন্ধান না পাওয়া অবধি এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম আমি।'

কুয়াশা সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়ল।

'ওখান থেকে আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি মি. কামাল এবং রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে কয়েকজন লোক। লোকগুলো ওদেরকে খুন করতে গেলে আমি গুলি করি—তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যাই। যাক, এরপর আবার একটা টেলিগ্রাম পাই আমি শফিকুল কাকার। তিনি আমাকে কক্সবাজারে আসতে বলেন। তাই করি আমি। কাকার সঙ্গে আমি দেওজী কাংকারিয়ার কাছে যাই। দেওজী কাকাকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করে ফেলে। আমাকে বলে, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার কাকা বেঈমানী করেছে। তোমার বাবার নির্দেশেই তোমার কাকাকে শাস্তি দেব আমরা। এরপর দেওজী আমাকে বলে তোমার বাবা এই মুহূর্তে খুব বিপদে আছে। তুমি যদি কুয়াশা আর তার বন্ধু বান্ধবদের জন্যে ফাঁদ পাততে আমাকে সাহায্য করো তাহলে তোমার বাবা এ যাত্রা বিপদ কাটিয়ে উঠবেন। বাবার স্বার্থে ওদের কথায় আমি রাজি হই। তারপরের ঘটনা তো আপনারা জানেনই। আপনাদেরকে ফাঁদে ফেলি আমি। তারপর দেওজী আর তার লোকেরা আমাকে বেঁধে একটা কামরায় ফেলে রাখে। সেই সময় আমি ওদের সঙ্গে শফিকুল কাকাকেও দেখি। আসলে শফিকুল কাকা ওদের দলের লোক। কাকাকে দেওজী মেরেছিল অভিনয় করে, আমার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে। মি. কুয়াশা, আপনি পরোপকারী—শুনেছি, আপনি নাকি অসহায়ের পরম বন্ধু। আমি জানি আমার বাবা সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাবা ওদের হাতেই বন্দী হয়ে আছে বলে মনে হয়। আমার বিশ্বাস বাবার কাছ থেকে আবিষ্কারের ফরমুলাটা আদায় করবে ওরা, তারপর বাবাকে মেরে ফেলবে। মি. কুয়াশা, আপনার দুটো পায়ে ধরি, আমার বাবাকে আপনি উদ্ধার করুন।' কেঁদে ফেলল সাঈদা শরমিন।

কুয়াশা শান্ত গলায় শুধু বলল, 'তোমার বাবাকে উদ্ধার করাই এখন আমার

প্রথম কর্তব্য। তুমি চিন্তা কোরো না, শরমিন।'

বালুকাবেলা থেকে ঘুর পথে হেঁটে জীপের কাছে চলে এল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল স্বয়ং কুয়াশা। শহরের দিকে ছুটে চলল জীপ।

শহরে পৌঁছে কুয়াশা একটা ওয়াচ স্টোরের সামনে জীপ দাঁড় করাল। কাউকে কিছু না বলে নেমে গিয়ে সোজা ঘড়ির দোকানে ঢুকল সে। ফিরে এল তিন মিনিট পরই।

সবাই দেখল কুয়াশার হাতে অনেকগুলো হাতঘড়ি। প্রত্যেককে একটা করে ঘড়ি দিল সে।

সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে। কুয়াশা জীপ ছেড়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'চট্টগ্রাম থেকে ওয়্যারলেসে আমার একজন সহকারীকে ঘড়িগুলো পাঠাতে বলেছিলাম। ঢাকায় থাকতেই তৈরি করেছিলাম এগুলো। ফিটিং-এর কাজ বাকি ছিল অবশ্য। ঘড়ির দোকানটা আমার এক পরিচিত লোকের, এই ঠিকানাতেই পাঠাতে বলেছিলাম।'

দ্রুত প্রত্যেকে পরে নিল একটা করে ঘড়ি। বলাই বাহুল্য, দেওজী কাংকারিয়া বা তার অনুচরেরা যে মেসেজ যেখানেই পাঠাক, ওরা সে মেসেজ এখন রিসিভ করতে পারবে অনায়াসে।

কক্সবাজারে এরপর কয়েকঘণ্টা কাটাল ওরা। হোটেলে বসে অপেক্ষা করছে সবাই। অপেক্ষা করছে মেসেজ রিসিভ করার জন্য। কয়েক ঘণ্টা পর একটা মেসেজ রিসিভ করল ওরা।

কিন্তু মেসেজটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ওদের।

ওরা মেসেজ পেয়ে বুঝতে পারল বিজ্ঞানী সাঈদ চৌধুরীকে নিয়ে শত্রুরা রওনা হয়েছে কোথাও।

ছয়

সগর্জনে উড়ে যাচ্ছে একটি হেলিকপ্টার।

সীটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী সাঈদ চৌধুরীকে। উন্মাদের মত চিৎকার করছেন তিনি, 'না-না! মেরে ফেলো তোমরা আমাকে! আমি মরতে রাজি আছি—কিন্তু তবু বলব না সে-কথা! আমার আবিষ্কারের ফরমুলা আমি কাউকে বলব না…!'

মুচকি মুচকি হাসছে শফিকুল কবীর। কথা বলে উঠল সে। তার হাতে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ দেখা যাচ্ছে।

'সাঈদ ভাই! অমন চেঁচিয়ো না বোকার মত। নিজের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো। ফরমুলাটা বললে ক্ষতি কি তোমার? একটা কাজের জিনিস আবিষ্কার করেছ—তার বদলে টাকা চাও—এই তো? টাকা দেব—কত টাকা চাও তুমি?'

'টাকা আমি চাই না!' চিৎকার করে উঠলেন প্রৌঢ় সাঈদ চৌধুরী, 'আমার

আবিষ্কারকে আমি অসৎ কাজে ব্যবহার করতে দেব না।'

'আমরা জানি তুমি ফর্মুলাটা বলবে না। তার জন্য আমরা তৈরি।'

শফিকুল কবীর দেওজী কাংকারিয়ার দিকে তাকাল। কাংকারিয়া মাথা কাত করে অনুমতি দিল।

শফিকুল কবীর সাঈদ চৌধুরীর বাহুতে ইঞ্জেকশনের সুচ বিঁধিয়ে দিল।

ইঞ্জেকশন পুশ করার পর শফিকুল কবীর, কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উলকা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল সাঈদ চৌধুরীর দিকে।

সাঈদ চৌধুরীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ভাবলেশহীন হয়ে উঠল। বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে। শরীরের মাংসপেশীগুলো ঢিলে, নরম হয়ে গেল তার।

মেসেজ রিসিভ করে ওরা জানতে পেরেছিল দেওজী কাংকারিয়া এবং তার দলের কয়েকজন লোক সাঈদ চৌধুরীকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে চলে যাচ্ছে খুলনা অভিমুখে। খুলনায় তাদের লোক আছে, তাদেরকে মেসেজ পাঠিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে কাংকারিয়া। কিন্তু মেসেজে সে উল্লেখ করেনি কোথায় তাদের 'কপ্টার ল্যাণ্ড করবে।

বিমান বন্দরে পৌঁছে ওরা সবাই দেখল কুয়াশার জন্য একটা হেলিকপ্টার সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিল কুয়াশা, 'দরকার লাগবে মনে করে চট্টগ্রামে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছিলাম আমার লোককে—সেই নিয়ে এসেছে 'কপ্টারটা।'

হেলিকপ্টারে চড়ে বসল সবাই। ক্যাপ্টেনের সীটে বসল রাজকুমারী এবং রাসেল।

পিছনের সীটে বসল কুয়াশা এবং শহীদ। 'কপ্টার আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজে মনোনিবেশ করল দু'জন। কাজটা কি তা যেন ওদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। মাঝে-মধ্যে কুয়াশা দ্রুত একটা নকশা আঁকছে কাগজে, তাকাচ্ছে শহীদের দিকে, শহীদ মাথা নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছে তাকে।

মিনিট বিশেক পর স্বাভাবিক হয়ে উঠল সাঈদ চৌধুরী। এতক্ষণ যেন সে ঘুমিয়ে ছিল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে কাঁপা গলায় সে জানতে চাইল, 'কি···কি বলেছি আমি?'

সহাস্যে শফিকুল কবীর বলে উঠল, 'কি বলেছ? জিজ্ঞেস করো, কি বলোনি! একবার নয়, দু'বার মুখস্থ বলে ফেলেছ তুমি তোমার আবিষ্কারের ফর্মুলা।'

মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সাঈদ চৌধুরীর। দু'চোখ ভরে উঠল পানিতে।

সান্তারাম উলকা বলল, 'ওকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।'

কাংকারিয়া একটু ভাবল। তারপর বলল, 'কুয়াশার ট্রুথ সেরাম ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা এখনও আমরা সঠিক জানতে পারছি না। ফর্মুলা বলেছে বটে ও, কিন্তু কিছু বাদ পড়েছে কিনা জানব কিভাবে আমরা? এক্সপেরিমেন্টের পর যখন বুঝতে পারব মৃত্যু-রশ্মি তৈরি করতে পেরেছি আমরা তখনই নিশ্চিত হওয়া যাবে। ততক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।'

কথাগুলো বলে কন্ট্রোল কেবিনে গিয়ে ঢুকল কাংকারিয়া। পাইলটকে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে। তারপর প্রকাণ্ড একটা ট্র্যান্সমিটারের সামনে গিয়ে বসল সে। শুরু করল মেসেজ পাঠাতে।

কাংকারিয়ার পাঠানো মেসেজ রিসিভ করল কুয়াশা এবং তার সঙ্গের বাকী সবাই।

শহীদ বলল, 'খুলনা শহর থেকে বিশ মাইল দূরে একটা মাঠ আছে—কাংকারিয়ার 'কপ্টার সেখানে নামবে। সম্ভবত, আশপাশে ওদের কোন হাইড-আউট আছে। ভোর তিনটের সময় ল্যাণ্ড করবে ওদের 'কপ্টার।'

দ্রুত কাজ শুরু করল কুয়াশা। সে-ও একটা মেসেজ পাঠাল। সিক্রেট সরকারী কোড ব্যবহার করল সে। খুলনায় পুলিস বিভাগের হেডকোয়ার্টারে পাঠাল সে মেসেজটা।

মেসেজের শেষ কয়েকটা কথা হলো: শত্রুদেরকে গ্রেফতার করার সময় খুব সাবধান! এরা নির্মম খুনী। খুন করাই এদের পেশা। খুব বেশি লোক যেন না থাকে মাঠে।

খুলনার পুলিস বিভাগ যে কোন মূল্যে শত্রুদেরকে গ্রেফতার করার জন্য তৈরি হলো। পুলিস কমিশনার দ্রুত থানাগুলোয় নির্দেশ পাঠালেন। শহরের বিভিন্ন থানা থেকে সশস্ত্র পুলিস ছুটে এল। তারা রওনা হলো কয়েকজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট মাঠের দিকে। সঙ্গে নিল তারা গ্যাস মাস্ক, স্টেনগান এবং টিয়্যার গ্যাস।

ভোর তিনটের বেশ কিছু আগেই সশস্ত্র পুলিসবাহিনী পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়। গোটা এলাকাটা ঘিরে ফেলা হলো। আশপাশের রাস্তায় মোতায়েন করা হলো প্রহরী। ইন্সপেক্টরদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে প্রত্যেকটি সেপাই পরে নিল গ্যাস মাস্ক।

এদিকে কাংকারিয়ার অনুচরেরা মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে পুলিস তৎপরতা দেখে পিছিয়ে গেল দ্রুত। তাদের হাতের হাতঘড়ি ব্যবহার করল তারা।

যথাসময়ে খবর পেল কাংকারিয়া।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে পুলিসবাহিনী। সবাই ভাবছে—শেষ পর্যন্ত আসবে তো 'কপ্টারটা?

ঠিক তিনটের সময় গর্জন শোনা গেল। উপর দিকে তাকিয়ে 'কপ্টারের আলো দেখতে পেল সবাই।

মাঠের উপর চক্কর মারতে লাগল সেটা। পুলিস বাহিনীর সকলের মনে সন্দেহের উদয় হলো—শত্রুরা টের পেয়ে গেল নাকি? 'কপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে না তো?

না। এতক্ষণে নেমে আসছে 'কপ্টারটা। কিন্তু 'কপ্টারের চাকা মাঠ স্পর্শ করার আগেই ঘটল আবার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে চারদিকে বিন্দু বিন্দু নীল আগুনের ফুলকি দেখা গেল হঠাৎ। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল সকলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পুলিস বাহিনীর প্রত্যেকে অনুভব করল, শ্বাস-প্রশ্বাস

ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের। আশপাশের বাতাস অকস্মাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে…।

ব্যস, এরপরের কোন ঘটনা তারা জানার সুযোগ পেল না।

'কন্টারটা যখন মাঠে নামল তখন পুলিস বাহিনীর একজন লোকও বেঁচে নেই।

কাংকারিয়ার অনুচরেরা এই সময় এবং সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গাড়ি নিয়ে সোজা মাঠে প্রবেশ করল তারা।

'কন্টারের আওয়াজ ইতিমধ্যে থেমেছে। কাংকারিয়া নেমে এল সবার আগে। তারপর সাঈদ চৌধুরী। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার পিছনে সান্তারাম উলকা এবং শফিকুল কবীর।

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। মাঠের এদিক সেদিক অনেকগুলো লাশ পড়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসল শুধু কাংকারিয়া।

জ্ঞান হারাল একজন। সাঈদ চৌধুরী তার আবিষ্কৃত কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের অপব্যবহার দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠল, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল গাড়ির ব্যাকসীটে।

তীরবেগে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল লাল অস্টিনটা।

সাত

পুলিস কমিশনার স্বয়ং ওয়্যারলেসে ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছিলেন। আচমকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বিপদ ঘটেছে বুঝতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা হন তিনি।

এরপর উদ্ধার কার্য শুরু হয়। পুলিসবাহিনীর প্রায় দেড়শো লোকের মধ্যে মাত্র বাঁচল এগারোজন। এই এগারোজনও ভয়ানক রকম অসুস্থ, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। অ্যাম্বুলেন্সে তুলে আহত লোকগুলোকে পাঠিয়ে দেয়া হলো পুলিস হাসপাতালে।

খবর, বিশেষ করে খারাপ খবর, কখনও চেপে রাখা যায় না। সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে খুলনা শহরেই শুধু নয়, সারা দেশে দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল।

খুলনার পুলিস কমিশনার শহরের প্রতিটি বাড়িতে অনুসন্ধান চালাবার কথা বিবেচনা করতে লাগলেন।

দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান সংবাদপত্রে একটি ফিচার ছাপা হলো রহস্য সম্পর্কে। ফিচারটা কে লিখেছে, লেখক তথ্যগুলো কোথা থেকে পেয়েছে তা জানা গেল না। ফিচারের প্রথম দিকেই লেখক জানিয়েছে—'বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ…।'

ফিচারের মূল বক্তব্য হলো—এখন জানা গেছে যে এই মৃত্যু-রশ্মির পিছনে একদল সুসংগঠিত দুষ্কৃতকারী রয়েছে। তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত। ফিচারে আভাস দেয়া হয়েছে, দুষ্কৃতকারীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ক্রমশ। অল্পসময়ের মধ্যেই তারা ধরা পড়তে বাধ্য। দুষ্কৃতকারীরা এই কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড বিদেশী কোন রাষ্ট্র বা শক্তির কাছে বিক্রি করতে চাইছে। একের পর এক হত্যাযজ্ঞ ঘটাচ্ছে তারা শুধু মাত্র তাদের হাতের অস্ত্রটা কী সাংঘাতিক রকমের

ভয়ঙ্কর তা প্রমাণ করার জন্য, যাতে যারা এই অস্ত্র কিনতে আগ্রহী তারা যে-কোন অঙ্কের টাকা দিয়ে এটা কিনতে পিছ-পা না হয়। মোট কথা, কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের দাম বাড়াবার জন্যই শয়ে শয়ে মানুষকে হত্যা করেছে দুষ্কৃতকারীরা।

ফিচারটা পড়ে বাংলাদেশস্থ অনেক বিদেশী সিক্রেট এজেন্ট কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

অনুসন্ধান চালাচ্ছিল কুয়াশা এবং তার দলবলও। কিন্তু ওদের সার্চ করার পদ্ধতি আর সকলের চেয়ে আলাদা। কক্সবাজার থেকে হেলিকপ্টারে করে আসার সময় কুয়াশা এবং শহীদ যে যন্ত্রটা তৈরি করেছে সেটা ব্যবহার করছিল ওরা। হেলিকপ্টারের ভিতর ছোটখাট একটা কেবিন ছিল, তাতে যন্ত্রপাতি ছিল প্রচুর। সেই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি করেছে ওরা এই যন্ত্রটা।

সংবাদপত্রে যে ফিচারটা ছাপা হয়েছে সেটা কুয়াশারই লেখা। কথাটা অবশ্য শহীদ ছাড়া আর কেউ জানে না।

খুলনার যে হোটেলটায় ওরা উঠল সেই হোটেলের রুমেই ওদের তৈরি বিশেষ যন্ত্রটা স্থাপন করা হলো। যন্ত্রটা আসলে কাংকারিয়ার ইনফ্রা-রে রেডিও সেণ্ডার-এর মতই একটা মেশিন। একই ধরনের, একই কাজের উপযুক্ত।

যন্ত্রটা স্থাপন করার পর সুইচ অন করল কুয়াশা। দ্রুত মেসেজ পাঠাল সে।

সবাই নিরবে তাকিয়ে দেখছে তার কাজকর্ম।

কুয়াশা যে মেসেজ পাঠাল সেই মেসেজ রিসিভ করল কাংকারিয়ার প্রত্যেক অনুচর। তারা মেসেজটাকে কাংকারিয়ার পাঠানো মেসেজ বলেই মনে করল। অন্য রকম মনে করার কোন কারণই ঘটল না।

চমকে উঠল শুধু কাংকারিয়া, সান্তারাম উলকা এবং শফিকুল কবীর। নিজেদের হাতঘড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তারা। কি ঘটছে তা বুঝতেই পারল না প্রথমে। তারপর তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস।

'অসম্ভব! এ হতে পারে না!'

শফিকুল কবীর বোকার মত মাথা নাড়তে লাগল।

'কিন্তু এ রকম কাণ্ড কে করতে পারে! কুয়াশার ব্রেন ছাড়া...'

কাংকারিয়া বলে উঠল, 'কি বলতে চাও তুমি, উলকা? শয়তান কুয়াশা বেঁচে আছে?'

'অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা বোধহয় সত্যি। সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কুয়াশা ছাড়া আর কারও পক্ষে আমাদের মত ইনফ্রা-রে রেডিও সেণ্ডার তৈরি করা সম্ভব নয়।'

কাংকারিয়া দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'সে যাই হোক—এটা বন্ধ করতে হবে যেভাবে হোক।'

কথাগুলো বলেই সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একটা ডুপ্লিকেট ইনফ্রা-রে ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রের সামনে। সুইচ অন করল। পরমুহূর্তে প্রায় আর্তনাদ করে উঠে ছিটকে চলে এল কামরার মাঝখানে। কাঁপছে কাংকারিয়া।

'এ নিশ্চয়ই কুয়াশার কাণ্ড! মেসেজ পাঠাচ্ছে সে। শুনলে, কি রকম ডিসটার্ব করছে আমাদের মেশিন? শয়তানটা তার সেট অন করে রেখেছে—যতক্ষণ ওটা অন করা থাকবে ততক্ষণ আমাদের এই সেট থেকে পাঠানো কোন মেসেজ কেউ রিসিভ করতে পারবে না। আমাদের সেটের চেয়ে শয়তানটার সেট অনেক বেশি শক্তিশালী···।'

সান্তারাম উলকা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তীরে এসে তরী ডুববে—তা হতে পারে না!'

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল সে। নিজেদের দলের কয়েকজনকে দ্রুত ফোন করে নির্দেশ দিল সে, 'তোমাদের অধীনে যত লোক আছে তাদের সবাইকে আমাদের আস্তানায় পাঠিয়ে দাও। সাবধান, কেউ যেন রিস্টওয়াচের নির্দেশ অনুযায়ী মুভ না করে।'

কুয়াশা মেসেজ পাঠিয়ে বসে নেই। মেসেজে সে কাংকারিয়ার প্রত্যেক অনুচরকে শহরের একটা পার্কে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে।

মেসেজ পাঠিয়ে কুয়াশা কামাল এবং রাসেলকে পাঠিয়ে দিয়েছে পার্কে। কাংকারিয়ার অনুচরদের ধরে আনবে তারা।

পার্কে পৌঁছুল ওরা। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরই দু'জন লোককে দেখল ওরা। এরা কাংকারিয়ার লোক তা জানা গেল তাদের সন্দেহজনক আচরণ দেখে।

অনায়াসে লোক দু'জনকে গ্রেফতার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল ওরা হোটেলে। বড় আকারের হাতঘড়িগুলো পাওয়া গেল ওদের পকেটে। চেয়ারে বসিয়ে, চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো দু'জনকে, কুয়াশা একজনের সামনে দাঁড়াল। শান্ত গলায় জানতে চাইল সে, 'কি নাম তোমার?'

ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে লোকটার। কাঁপা গলায় সে উত্তর দিল, 'কেশব চন্দ্র।'

'দেওজী আর সান্তারাম—কোথায় তারা?'

ঢোক গিলল লোকটা মাথা নাড়ল ঘন ঘন। উত্তর দেবে না, বোঝাতে চাইছে সে।

'দেওজী মেরে ফেলবে!' প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করে কথাটা বলল লোকটা।

কুয়াশা লোকটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার ঘাড়টা চেপে ধরল হাত দিয়ে জোরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা। এরপর আর কোন অসুবিধে হলো না। গড়গড় করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে।

রাত নামল। কেশব চন্দ্র এবং আবদুল হককে পাঠিয়ে দেয়া হলো থানা-হাজতে।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল ওরা। হঠাৎ কামাল বলে উঠল, 'কুয়াশা কোথায়!'

সবাই এদিক ওদিক তাকাল। রুমের ভিতর নেই কুয়াশা। কখন যেন, সকলের অগোচরে, হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সে।

রাত আটটায় শহীদ বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে, বলে গেল ও।

ন'টা বাজল।

ফেরেনি তখনও কুয়াশা।

রাজকুমারী এবং রাসেলের উপর ট্র্যান্সমিটার পাহারা দেয়ার দায়িত্ব।

কামাল এবং ডি. কস্টা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তিনজনের জন্যে ডিনারের অর্ডার দিল। রাজকুমারী আর রাসেল এখুনি খাবে না, জানিয়ে দিয়েছে।

সাঈদা শরমিন গালে হাত দিয়ে বসে আছে একটা চেয়ারে।

ডিনার শেষ করে কামাল এবং ডি. কস্টা উঠে দাঁড়াল একযোগে। এতক্ষণ নিচু গলায় আলোচনা করেছে ওরা।

ডি. কস্টা রাজকুমারীর উদ্দেশে বলল, 'হামরা ডুই ফ্রেণ্ড একটু ভ্রমণ করিয়া আসি। হাপনারা পাহারায় ঠাকুন। বী কেয়ারফুল, হাইজ্যাক হইবার ডর আছে! এনিমি আসিলে হামরা না রিটার্ন করা অবডি ওয়েট করিটে বলিবেন।'

পাশের রুমে চলে গেল ওরা। কাপড় চোপড় ছেড়ে দু'জনেই ছদ্মবেশ নিল। মিনিট বিশেক পর সেই রুম থেকেই করিডরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। সাদা চাপদাড়ি সহ বৃদ্ধের ছদ্মবেশ নিয়েছে ওরা।

কেশব চন্দ্র কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে কাংকারিয়ার আস্তানার ঠিকানা। কাংকারিয়ার আস্তানায় হানা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই কামাল এবং ডি. কস্টা হোটেল ছেড়ে বেরিয়েছে।

ওদের ধারণা, কুয়াশা এবং শহীদ আলাদা আলাদা ভাবে গেলেও ওরা আসলে কাংকারিয়ার আস্তানায় হানা দেবার জন্যই গেছে।

শহরের মধ্যেই কাংকারিয়ার আস্তানা। পাঁচতলা একটা হোটেলের পাশেই বাড়িটা। তিনতলা। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে নিরাশ হলো ওরা। গাঢ় অন্ধকারে ভিতরটা ঢাকা। বাড়ির গেটেও তালা ঝুলছে। ভিতরে মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

'পিছন দিক দিয়ে ঢুকব আমরা।'

কামাল দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। পিছু নিল বৃদ্ধ ডি. কস্টা।

বাড়িটার পিছন দিকের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকল ওরা। বাগানের ভিতর দিয়ে কয়েক পা এগোতেই আশপাশ থেকে একদল লোক বুনো শুয়োরের মত ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আক্রমণটা এমনই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে কামাল বা ডি. কস্টা বাধা দেবার সময় পর্যন্ত পেল না। শত্রুরা দ্রুত ওদের দু'জনের হাত-পা এবং মুখ বেঁধে ফেলল। দুই বৃদ্ধকে কাঁধে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল তারা।

আট

দোতলার যে কামরায় ওদেরকে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে বসিয়ে দেয়া হলো সেটা আধুনিক আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত। সোফা সেট, আরাম কেদারা, মেঝেতে কার্পেট, বুক শেলফ—সবই আছে।

কার্পেটের উপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওদের মত আর একজন বন্দীকে দেখল ওরা। শত্রুরা ওদের মুখ বাঁধবার প্রয়োজন বোধ করল না। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তারা। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। ডি. কস্টা বন্দী লোকটার উদ্দেশে বলে উঠল, 'আসসালায় মালায়কুম। হাপনার পরিচয় কি, মিস্টার?'

কামাল ধমকে উঠল, 'আহ্, থামুন।'

কথাটা বলে কামাল বন্দী লোকটার দিকে তাকাল। বলল, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়—আপনি নিশ্চয়ই মি. সাঈদ চৌধুরী—তাই না?'

বিজ্ঞানী সাঈদ চৌধুরী কামালকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের চেহারায় নৈরাশ্যের কালো ছায়া। মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ। আপনারা?'

কামাল বলল, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব মুষড়ে পড়েছেন। শত্রুরা আপনার ওপর অত্যাচার করেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু যা ঘটবার ঘটেছে—আর কিছু ঘটবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—কুয়াশা আমাদেরকে উদ্ধার করবে।'

সাঈদ চৌধুরী ভাঙা গলায় বলল, 'উদ্ধার করলেই কি, না করলেই কি। সর্বনাশ যা ঘটবার ঘটে গেছে। শয়তানরা আমার শরীরে ট্রুথ সেরাম ইঞ্জেক্ট করেছিল, নিজের অজ্ঞাতে আমি আমার আবিষ্কৃত মৃত্যু-রশ্মির ফর্মুলা ওদেরকে বলে দিয়েছি।'

ডি. কস্টা অকস্মাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। সাঈদ চৌধুরী তার দিকে চেয়ে রইলেন। ডি. কস্টার হাসির কারণটা তিনি বুঝতে পারছেন না।

হাসি থামিয়ে ডি. কস্টা বলে উঠল, 'নো চিন্টা, মিস্টার, ডু ফুর্টি! হাপনি জানেন না হাপনি এনিমিডেরকে কিভাবে ঘোলাপানি খাওয়াইয়াছেন! হামার বস্—থুড়ি, হামার ফ্রেণ্ড মি. কুয়াশা অটি বুড্ডিমান—টিনি সব কাজ করেন বুড্ডির সাহায্যে। মি. কুয়াশা জানেন, হামরা এনিমিডের হাটে যে কোন মোমেন্টে গ্রেফটার হইটে পারি এবং এনিমিরা হামাডের ট্রুথ-সেরাম হামাডের বিরুড্ডেই ব্যবহার করিটে পারে হামাডেরকে ডিয়া কঠা বলাইবার জন্য। টাই টিনি বুড্ডি খরচ করিয়া ট্রুথ সেরামের বটলে লাই-সেরাম এবং লাই-সেরামের বটলে ট্রুথ সেরাম-এর লেবেল আঠা ডিয়া সাঁটিয়া রাখেন। শফিকুল কবীর যে বটলটা চুরি করিয়া নিয়া আসিয়াছিল সেই বটলের গায়ে ট্রুথ-সেরামের লেবেল ঠাকিলেও উহা আসলে লাই-সেরাম। অঠাট

হাপনি এনিমিডেরকে হাপনার ইন্‌ভেনশনের রিয়েল ফর্মুলা না ডিয়া ফলস্‌ ফর্মুলা ডিয়াছেন…।'

'মাই গড! বলেন কি! সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি আমি আসল ফর্মুলাটা ওদেরকে দিইনি?'

সাঈদ চৌধুরীর কথা শেষ হতেই গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল থরথর করে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো সেই সঙ্গে।

ডি. কস্টা মুচকি হাসল। বলল, 'ওই যে, হামার ফ্রেণ্ড মি. কুয়াশা বোমা ফাটাইটে ফাটাইটে হামাডেরকে মুক্ট করিটে আসিতেছেন!'

কামাল খেপে গিয়ে গর্জে উঠল, 'কচু!'

কামরার তিনটে দরজা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। একটি দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল দেওজী কাংকারিয়া, সান্তারাম উলকা এবং শফিকুল কবীর। বাকী দুটো দরজা খুলে সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়।

রাগে কাঁপছিল কাংকারিয়া। সান্তারাম দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

শফিকুল কবীরকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে।

কাংকারিয়া প্রায় ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সাঈদ চৌধুরীর সামনে। সবুট লাথি মারল সে সাঈদ চৌধুরীর বুকে।

তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন সাঈদ চৌধুরী।

কাংকারিয়া চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল, 'কুত্তার বাচ্চা! আমার সঙ্গে চালাকি! তোর ফর্মুলা পরীক্ষা করতে গিয়ে আর একটু হলে জানটাই চলে যাচ্ছিল!'

আবার লাথি মারল কাংকারিয়া সাঈদ চৌধুরীর পেটে। 'এখনও যদি ভাল চাস তো বল!'

গর্জে উঠল ডি. কস্টা, 'ইউ সান অব আ বীচ! টোর চৌড্ড পুরুষের নিকুচি করি হামি…!'

লাফ দিয়ে কামাল এবং ডি. কস্টার সামনে এসে দাঁড়াল কাংকারিয়া। অন্ধ আক্রোশে এলোপাথাড়ি লাথি চালাতে লাগল সে দু'জনের দিকে।

ক্লান্ত না হওয়া অবধি থামল না কাংকারিয়া। হাঁপাতে লাগল সে সশব্দে। একটাও কথা না বলে আবার গিয়ে দাঁড়াল সাঈদ চৌধুরীর সামনে। 'বলবি কিনা বল!'

সাঈদ চৌধুরী কথা না বলে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

এরপর শুরু হলো টরচার। কাংকারিয়া, শফিকুল কবীর এবং সান্তারাম উলকা—তিনজন মিলিতভাবে দৈহিক অত্যাচার চালাতে লাগল সাঈদ চৌধুরীর উপর।

সহ্য করার একটা সীমা আছে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল অত্যাচার।

পরাজয় স্বীকার করলেন সাঈদ চৌধুরী। কথা বলতে শুরু করলেন তিনি।

এবার তিনি তাঁর আবিষ্কৃত কেমিক্যাল-কম্পাউণ্ডের প্রকৃত ফর্মুলাটা প্রকাশ

করে দিলেন।

আচমকা গুলির শব্দ ভেসে এল সিঁড়ির দিক থেকে। পরপর কয়েকটা গুলি হলো। পরমুহূর্তে বারান্দায় ধস্তাধস্তির শব্দ হলো।

মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাংকারিয়া এবং তার দলের লোকেরা। কিন্তু তারপরই লাফ দিয়ে ছুটল কাংকারিয়া। একটি দরজা পেরিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল শফিকুল কবীর।

কিন্তু সান্তারাম উলকা তখনও কামরা থেকে বেরোয়নি। পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করছে সে।

ঠিক সেই সময় বাইরের বারান্দায় ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া গেল। কে যেন ছুটে আসছে এ দিকে।

সান্তারাম উলকা রিভলবার বের না করে লাফ দিল। ঠিক সেই সময় কামরার ভিতর ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল কুয়াশা। সান্তারাম তখনও কামরার ভিতর রয়েছে। পিছু ধাওয়া করলে তাকে ধরা যায় অনায়াসে। কিন্তু কুয়াশা সে চেষ্টা না করে বিদ্যুৎবেগে পকেট থেকে কি যেন বের করে ছুঁড়ে দিল সান্তারাম উলকার দিকে।

পরমুহূর্তে সান্তারাম উলকা দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে গেল পিছনদিকের বারান্দায়। তার ছুটন্ত পদশব্দ ভেসে আসছে—ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা।

নিচ থেকে তখনও গুলির শব্দ হচ্ছে। শহীদের নেতৃত্বে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিস শত্রুপক্ষের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

দ্রুত তিনজনের বন্ধন মুক্ত করল কুয়াশা। প্রায় চিৎকার করে উঠল সে, 'বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাও সবাই—এই মুহূর্তে!'

কথাগুলো বলে সাঈদ চৌধুরীর অজ্ঞান দেহটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটল সে।

নিচে নেমে এল ওরা হুড়মুড় করে। শহীদ এগিয়ে এল একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে।

কুয়াশা বলল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো এখুনি।'

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে পৌঁছুল ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। কেঁপে উঠল গোটা এলাকাটা।

কুয়াশার অনুমানই সত্য প্রমাণিত হলো। কাংকারিয়া তার এই আস্তানাটাও প্রয়োজনে বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

নয়

সাঈদ চৌধুরীর অবস্থা গুরুতর। উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার তার। কুয়াশা তাঁকে নিজের হোটেলে নিয়ে এল। নিজেই সে সাঈদ চৌধুরীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিল।

অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই জ্ঞান ফিরল সাঈদ চৌধুরীর। শুধু তাই নয়, কুয়াশার নিজের তৈরি বিশেষ ক্যাপসুল খেয়ে এবং ইঞ্জেকশন নিয়ে সাঈদ চৌধুরী ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। ব্যথা-বেদনা, দুর্বলতা-ক্লান্তি সব যেন উবে গেছে শরীর থেকে।

সাঈদ চৌধুরী বারবার বলছিলেন, 'শফিকুলকে আমি ক্ষমা করব না। ওকে আমি দেখে নেব!'

কুয়াশা বলল, 'আমরা সবাই এখন বাইরে যাব। মি. সাঈদ, আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে এখানে থাকবেন।'

সাঈদ চৌধুরী বলল, 'আমাকেও নিয়ে চলুন।'

কুয়াশা বলল, 'তা হয় না। আমরা একদল বর্ন-ক্রিমিন্যালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আপনি প্রায় বৃদ্ধ—সামলাতে পারবেন না।'

কুয়াশার পিছন পিছন হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ জানে না কুয়াশা কোথায় যাবে।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। উল্কাবেগে ছুটে চলল গাড়ি।

কাংকারিয়া এবং তার দলবলকে বন্দী করার জন্য যাচ্ছে কুয়াশা। সে জানে শত্রুরা কোথায় আছে।

রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা পকেট থেকে একটা ঘড়ির মত দেখতে ছোট্ট যন্ত্র বের করল। জিনিসটা দেখা মাত্র সবাই বুঝতে পারল রহস্যটা।

কাংকারিয়ার আস্তানায় কুয়াশা ইচ্ছা করলেই সান্তারাম উলকাকে বন্দী করতে পারত। কিন্তু কুয়াশা শুধু সান্তারামকে না, গোটা দলটাকে পাকড়াও করতে চায়। তাই সে সান্তারামকে পালাবার সুযোগ দেয়।

তবে পালাতে দেবার আগে একটা কাজের কাজ করে ফেলেছিল কুয়াশা। পকেট থেকে পালভারাইজড পাউডার বের করে ছুঁড়ে দিয়েছিল সে সান্তারামের পিছন দিকে। তার কোটের পিছন দিকে লেগে আছে এখনও সেই পাউডার। পাউডারটা আসলে একটা দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়। এই খনিজ পদার্থের মধ্যে অত্যাশ্চর্য চৌম্বক শক্তি বিদ্যমান। কুয়াশা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার দ্বারা এই পাউডার যার গায়ে থাকবে তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব অনায়াসে।

শহর ছাড়িয়ে তীরবেগে ছুটছে গাড়ি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এক নাগাড়ে গাড়ি চালাবার পর বাঁক নিল কুয়াশা।

মেঠো পথ ধরে ছুটল গাড়ি।

কুয়াশার হাতের ছোট্ট যন্ত্রটার ডায়ালের মাঝখানে একটা কাঁটা রয়েছে। হঠাৎ কাঁটাটা দ্রুত তালে কাঁপতে শুরু করল। ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল সে। বলল, 'আশপাশেই আছে ওরা।'

গাড়ি থেকে নিঃশব্দে নামল সবাই। চারদিকে বেশ গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। বাড়ি ঘরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কুয়াশা এগোল আগে আগে। প্রায় তিনশো গজ হাঁটার পর থমকে দাঁড়াল সে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা উঁচু বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির উপরতলায় আলো জ্বলছে। বাড়িটা তিনতলা। সুরম্য অট্টালিকা বলতে যা বোঝায় তাই। বাড়ির সামনে সুন্দর একটা বাগান। কোন ধনী লোকের বাগান বাড়ি বলে মনে হয়।

'সম্ভবত, খুব বেশি লোকজন নেই বাড়িটায়। কাংকারিয়া এখনও তার দলের সব লোককে এই নতুন আস্তানার কথা জানাবার সুযোগ পায়নি।'

শহীদ নিচু গলায় বলল, 'একসঙ্গে না ঢুকে আলাদা আলাদা ভাবে ঢুকলে কেমন হয়?'

'তুমি ঠিকই বলেছে। সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেখান দিয়ে যার সুবিধে মনে হয় ভিতরে ঢুকে পড়ো। সাবধান, একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কেউ গুলি করবে না।'

বাড়িটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা।

কুয়াশা কোন দিকে গেল তা কেউ দেখতে পেল না। হঠাৎ যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ভিতরে ঢুকল কামাল এবং ডি. কস্টা। ডান পাশের পাঁচিল টপকাল রাজকুমারী এবং রাসেল। শহীদ একা বাড়ির সামনে দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

বাগান ছাড়িয়ে ফাঁকা উঠানের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঁচু বারান্দার দিকে এগোল ও। হঠাৎ চমকে উঠল উপর দিকে চোখ পড়তেই।

একটা লোক পানির পাইপ বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে। আবছা অন্ধকারে লোকটাকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে দেখার পর শহীদের সন্দেহ দূর হলো। লোকটা শত্রুপক্ষের কেউ নয়। স্বয়ং কুয়াশা পানির পাইপ বেয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

বারান্দায় পৌঁছুল শহীদ, কুয়াশার কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। শত্রুপক্ষের লোকজন সবাই এসে পৌঁছায়নি এখনও।

কাংকারিয়া বিপদের আশঙ্কা করছে বলেও মনে হয় না। তার এই নতুন আস্তানার খবর কেউ জানতে পারেনি বলে ভেবেছে হয়তো সে। তাই বাড়ির কোথাও কোন প্রহরী নেই।

বারান্দা ধরে এগোল শহীদ। বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে একটা টর্চ বের করল। অপর হাতে রয়েছে উদ্যত পিস্তল।

অনেক খুঁজেও সিঁড়ির সন্ধান পেল না শহীদ। রহস্যটা বুঝতে পারল না। সিঁড়ি ছাড়া উপরে ওঠে কেমন করে? তবে কি এলিভেটর আছে? কিন্তু, কোথায়...?

পকেট থেকে মাস্টার কী বের করল শহীদ।

বারান্দার সঙ্গে পাশাপাশি অনেকগুলো বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি দরজায় তালা ঝুলছে।

একটি দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল শহীদ। ফাঁকা, শূন্য কামরা। কামরায় আরও দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে পা বাড়াল ও। তালা খুলে পাশের

কামরায় ঢুকল। না, এ কামরাতেও লিফট বা এলিভেটর কিংবা সিঁড়ি—কিছুই নেই।

আরও একটা দরজার তালা খুলল শহীদ।

এবার যে কামরায় প্রবেশ করল ও সেটা আকারে আগেরগুলোর চেয়ে চারগুণ বড়, প্রকাণ্ড একটা হলরুমের মত দেখতে। টর্চের আলোয় প্রকাণ্ড কামরাটার দৃশ্য দেখে চমকে উঠল ও।

কামরার সর্বত্র আশ্চর্য সব জিনিস সাজানো রয়েছে। প্রতিটি জিনিসই যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ সরঞ্জামের এমন প্রদর্শনী এর আগে দেখেনি শহীদ।

অত্যাধুনিক অগ্নি-নিক্ষেপক যুদ্ধাস্ত্র, বড় মর্টারের ছোট ছোট মডেল, ফাইটার প্লেনের মডেল, ট্যাঙ্কের মডেল, ফ্লোটিং স্টীল নেট—এই সবের সঙ্গে রয়েছে অটোমেটিক বম-সাইটার। মেশিনগান, স্টেনগান, রাইফেল—এসব তো আছেই।

কামরাটার এক প্রান্তে একটা সিঁড়ি দেখা গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল শহীদ। উপর থেকে কাদের যেন গলা ভেসে আসছে।

দোতলায় উঠে করিডরে থামল শহীদ। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কোন্ দিক থেকে ভেসে আসছে শব্দ। তারপর পা টিপে টিপে এগোল ও।

বন্ধ একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শহীদ। কামরার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে আলো জ্বলছে। কী হোলে চোখ রেখে ভিতরে কাউকে দেখতে পেল না ও। তবে কাংকারিয়ার নাম ধরে একজন লোক কথা বলছে।

কথা বলছে সান্তারাম উলকা।

'কাংকারিয়া, ক্রেতারা এই মাত্র খবর পাঠিয়েছে—আসছে তারা।'

শফিকুল কবীরের গলা শোনা গেল, 'প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলব আমরা।'

কাংকারিয়া বলল, 'কাউকে জানতে দেয়া হবে না যে ক্রেতার সংখ্যা একাধিক। প্রত্যেককে বলব আমরা আপনিই একমাত্র ক্রেতা—আপনার কাছেই কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড বিক্রি করতে যাচ্ছি আমরা। এই মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য বহু মানুষকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। ক্রেতারা কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে বারবার আমাদেরকে বাধ্য করেছে হত্যাযজ্ঞ সংঘঠিত করতে। জিনিসটার ক্ষমতা যে কি ভয়ঙ্কর তা এখন বুঝতে পেরেছে সবাই। ক্রেতারা নিজেদেরকে যতই বুদ্ধিমান মনে করুক, আমরা জানি আমরা কি করব। কঠোর পরিশ্রম করেছি আমরা, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঝুঁকি নিয়েছি শতবার। সুতরাং অল্পে সন্তুষ্ট হচ্ছি না আমরা। একই ফর্মুলা আমরা বিক্রি করব এক ডজন কিংবা তারও বেশি ক্রেতার কাছে।'

দ্রুত ভাবছিল শহীদ। বন্ধ কামরার ভিতর কাংকারিয়া সান্তারাম এবং শফিকুল—তিন শয়তানই আছে। দরজা ভেঙে আচমকা আক্রমণ করলে তিনজনকেই বন্দী করা সম্ভব। দরজাটা পরীক্ষা করে নিরাশ হলো শহীদ। কাঠের দরজা, কিন্তু ভিতরে ইস্পাতের পাত রয়েছে।

একজনের একবারের গায়ের ধাক্কায় দরজা ভাঙবে বলে মনে হয় না। আর

একটা উপায় অবশ্য আছে। গুলি করা যেতে পারে কী হোলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শত্রুরা কয়েক মুহূর্ত সময় পাবে সাবধান হবার জন্য। শেষ পর্যন্ত কী হোলে গুলি করারই সিদ্ধান্ত নিল শহীদ। পিস্তল তুলে গুলি করতে যেতেই নিচু গলায় পিছন থেকে কুয়াশা বলে উঠল, 'না।'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ। কুয়াশা ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

কামরার ভিতর থেকে কাংকারিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ওরা দু'জনই কান পেতে শুনতে লাগল তার কথা।

'সান্তারাম, তুমি এখুনি মেসেজ পাঠিয়ে দাও আমাদের সব সহকারীদেরকে। জানিয়ে দাও যে কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড কিনতে আগ্রহী যে কোন পার্টির সঙ্গে তারা যেন যোগাযোগ করে তাদের অফার সম্পর্কে জেনে নেয়। মূল্য বাবদ কে কত টাকা দিতে চায় তা যেন আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে জানায় আমাকে সবাই।'

শহীদ এবং কুয়াশা পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল।

নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভিতর। সম্ভবত, সান্তারাম অন্য কামরায় চলে গেছে মেসেজ পাঠাতে।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। মিনিট তিনেক পরই সান্তারামের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ভয়ানক কাণ্ড! রেডিওর এরিয়াল কাজ করছে না। মেসেজ পাঠানো কোন মতে সম্ভব নয় এখন।'

এতক্ষণে শহীদ বুঝতে পারল কুয়াশা পানির পাইপ বেয়ে কেন ছাতে উঠেছিল।

কুয়াশা ফিসফিস করে বলল, 'দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা যাবে না। কী হোলে গুলি করেও লাভ নেই। ভিতর থেকে দরজায় অনেকগুলো তালা লাগানো আছে। অন্যান্য কয়েকটা কামরার দরজা পরীক্ষা করে সবগুলোতে একই ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি। এসো আমার সঙ্গে।'

পা বাড়াল ওরা। ঠিক সেই সময় সাইরেনের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল।

শত্রুরা বিপদ টের পেয়ে গেছে!

বাঁক নিল কুয়াশা এবং শহীদ। রাজকুমারী এবং রাসেলকে দেখা গেল, ছুটে আসছে তারা। তাদের পিছন পিছন আসছে কামাল ও ডি. কস্টা।

দাঁড়াল না কুয়াশা।

দ্বিতীয় বাঁকটা সামনেই। সবাই কুয়াশাকে অনুসরণ করছে।

কুয়াশা বাঁকটা ঘুরতেই গুলির শব্দ হলো। পাঁচ ছয়জন লোক ছুটে আসছিল, কুয়াশাকে দেখেই তাদের একজন গুলি করেছে।

রিভলবারের গুলি কুয়াশার বুকে লাগল। কিন্তু বুলেটটা তাকে কাবু করতে পারল না। বুলেট প্রুফ বর্ম রয়েছে কুয়াশার বুকে। সিংহের মত হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল কুয়াশা।

শত্রুদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল কুয়াশা। দুটো ঘুসি মেরে দু'জনকে অজ্ঞান করে ফেলল সে। বাকী চারজন কুয়াশার উপর লাফিয়ে পড়ল।

গা ঝাড়া দিল কুয়াশা। ছিটকে চারজন চারদিকে গিয়ে পড়ল।

শহীদ এবং অন্যান্যরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শত্রুদের জন্য কুয়াশা একাই যথেষ্ট মনে করে এগোচ্ছে না কেউ।

চার দুশমন উঠে দাঁড়াল।

কুয়াশা শান্তভাবে এগিয়ে গেল একজনের দিকে। লোকটা পিছিয়ে যেতে শুরু করল। হঠাৎ ডানদিকে লাফ দিয়ে অপর একজন শত্রুর উপর গিয়ে পড়ল কুয়াশা।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দ্রুত লোকটাকে শূন্যে তুলে নিল কুয়াশা। দেহটা ছুঁড়ে দিল সবেগে সামনের লোকটার দিকে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে বাঁ দিকে ছুটে গেল সে। তৃতীয় লোকটা পিছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করছিল। কুয়াশা তার ঘাড়টা চেপে ধরল, জোরে একবার চাপ দিয়েই ছেড়ে দিল ঘাড়টা।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

চতুর্থ লোকটা পালাচ্ছিল, ডি. কস্টার ল্যাঙ খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কামাল তার পাঁজরে সবুট লাথি মারতে জ্ঞান লোপ পেল তার।

কালবিলম্ব না করে ছুটল আবার সবাই। কুয়াশা আগে আগে ছুটছে। সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে সে। বিনাবাক্যব্যয়ে সবাই তাকে অনুসরণ করছে।

সিঁড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। একজন লোকের আর্তচিৎকার ভেসে এল দূর থেকে। কণ্ঠস্বরটা পরিচিত—সাঈদ চৌধুরীর।

আবার ছুটল কুয়াশা।

সিঁড়ি বেয়ে উপরের করিডরে উঠে তীরবেগে দৌড়ুতে শুরু করল কুয়াশা। কোথায় সে যাচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কেউ কোন প্রশ্নও করছে না তাকে। কুয়াশা যা করে ভেবেচিন্তেই করে। সকলের অগাধ আস্থা তার উপর। প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করল না কেউ।

করিডর ধরে খানিকদূর গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। পকেট থেকে আগেই চাবির গোছা বের করে রেখেছে সে। তালা খুলল দ্রুত। অন্ধকার কামরার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এক মুহূর্ত পরই আলো জ্বলে উঠল কামরার ভিতর।

কুয়াশা কামরার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। লোহার একটা ঢাকনি দেখা যাচ্ছে। সেটা নিঃশব্দে তুলে সরিয়ে রাখল সে এক পাশে। একটা গোল গর্ত দেখা গেল ঢাকনিটা সরিয়ে ফেলার ফলে। কথা না বলে সেই গর্তের ভিতর ঢুকে গেল কুয়াশা।

কেউ কোন কথা বলল না। কুয়াশার মত শহীদও লাফ দিল গর্তের ভিতর। তারপর একে একে সবাই।

কাংকারিয়া এবং তার সহকারীরা যে কামরায় ছিল সেই কামরায় ঝুপ ঝুপ করে নামল ওরা সবাই।

বিপদ টের পেয়ে কাংকারিয়া কামরার এক প্রান্তে ছুটে গিয়ে একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে পালাবার জন্য তৈরি হয়ে গেল। এক সেকেণ্ড পরই কামরার ভিতর

প্রবেশ করল শফিকুল কবীর এবং সাঈদ চৌধুরী। সাঈদ চৌধুরীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে শফিকুল কবীর। ওদের পিছু পিছু ভিতরে ঢুকল আরও দু'জন। সাঈদা শরমিনকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসেছে একজন লোক।

সাঈদ চৌধুরী প্রতিশোধ নেবার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। কুয়াশা তাঁকে হোটেল থেকে বেরুতে নিষেধ করলেও মনে মনে তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন নিজের কর্তব্য।

সাঈদা শরমিনকে সঙ্গে নিয়ে কুয়াশাকে ফলো করে কাংকারিয়ার এই আস্তানায় পৌছান তিনি। কিন্তু ধরা পড়ে যান শফিকুল কবীর এবং কাংকারিয়ার একজন লোকের হাতে।

সাঈদ চৌধুরী তখনও ধস্তাধস্তি করছিলেন।

ঠিক সেই সময় সিলিংয়ের গর্তের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল কুয়াশা। 'হ্যাণ্ডস আপ!'

তড়াক করে লাফ দিল সান্তারাম উলকা। কাংকারিয়াও চোখের পলকে গিয়ে দাঁড়াল সাঈদ চৌধুরীর পিছনে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সান্তারাম উলকা। সাঈদা শরমিনের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। রিভলবারটা ধরেছে সাঈদা শরমিনের মাথার পিছনে।

অট্টহাসি থামিয়ে গর্জে উঠল সান্তারাম উলকা, 'খবরদার! কোনরকম চালাকি করো না! ফেলে দাও সবাই হাতের অস্ত্র! তা না হলে গুলি করে মেরে ফেলব একে!'

কামরার ভিতর একে একে শহীদ, কামাল, রাজকুমারী, ডি. কস্টা এবং রাসেল নেমে পড়েছে ইতিমধ্যে। সান্তারামের কথা শুনে পাথরের মত নিষ্প্রাণ, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা সবাই।

'গুলি করছি আমি!' দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে ঘোষণা করল সান্তারাম উলকা।

কথা বলে উঠল শান্ত গলায় কুয়াশা, 'সারেণ্ডার করছি আমরা। কথাটা বলে হাতের রিভলবার ফেলে দিল সে মেঝেতে। কুয়াশার দেখাদেখি আর সকলেও যে যার অস্ত্র ফেলে দিল।'

সগর্বে হাসল সান্তারাম উলকা। রিভলবারের নল ঘুরিয়ে নিল সে। লক্ষ্য স্থির করল কুয়াশার মাথার দিকে।

সান্তারাম উলকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কুয়াশাকে হত্যা করার এই সুবর্ণ সুযোগ আর কখনও আসবে না। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না সে।

শহীদ লক্ষ করছিল কুয়াশাকে। নিষ্পলক চেয়ে আছে সে সান্তারামের দিকে। এতটুকু নড়ছে না তার দেহ। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে লাফ দেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

সবাই তাকিয়ে আছে সান্তারাম উলকার দিকে। এই বুঝি গুলি করল সে।

'দাঁড়াও!'

কাংকারিয়া রিভলবার হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল কামরার এক প্রান্তে। ম্যান

হোলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, 'এবার করো গুলি।'

গুলির শব্দ হলো পরমুহূর্তেই।

কিন্তু সান্তারাম নয়, গুলি করেছেন সাঈদ চৌধুরী।

সাঈদ চৌধুরীর পকেটে তখনও ছিল অতিরিক্ত রিভলবারটা। সেটা বের করে গুলি করেছেন তিনি।

সাঈদ চৌধুরী গুলি করেছেন শফিকুল কবীরকে লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে। শফিকুল কবীরের লাগেনি গুলি। তার কোটের বুক পকেট ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা।

শফিকুল কবীরের গায়ে না লাগলেও সান্তারাম উলকার বুকে গিয়ে লেগেছে বুলেটটা। তার শার্টে একটা ফুটো তৈরি হলো। চোখের পলকে দেখা গেল সেই ফুটো দিয়ে সশব্দে কলের পানির মত তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে।

সশব্দে পড়ে গেল দেহটা মেঝেতে।

প্রায় একই সময় কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল আরও। চারদিক থেকে ভেসে এল রিভলবারের শব্দ। কাংকারিয়া সুইচ বোর্ডের একটা সুইচে আঙুল ঠেকাতেই অন্ধকার হয়ে গেল কামরাটা।

অন্ধকার রুমের ভিতর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল।

শহীদ টর্চ জ্বালল। শত্রুদেরকে চেনা গেল টর্চের আলোয়। কয়েকজন অনুচর ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, তারা পালাবার পথ খুঁজছে।

কুয়াশা একাই একশো। একাই সে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে বেড়াতে লাগল কামরার চারদিকে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে ফেলছে।

এমন সময় কাংকারিয়া আরও একটা সুইচে হাত দিল। দ্রুত কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল কামরা। আধহাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী, কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড।

সত্যিই তাই। অকস্মাৎ কামরার সর্বত্র উড়ে বেড়াতে দেখা গেল লাল নীল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

শহীদ অনুভব করল, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। শুধু শহীদ নয়, সবাই হঠাৎ বাতাসের তীব্র অভাব বোধ করল।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠল কামাল, রাসেল, ডি. কস্টা, রাজকুমারী।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ওরা।

'কুয়াশা!' নিস্তেজ গলায় ডাকল শহীদ।

কুয়াশার সাড়া পাওয়া গেল না।

কয়েক সেকেণ্ড পর শহীদ হঠাৎ অনুভব করল শ্বাসকষ্ট দূর হয়ে যাচ্ছে, বাতাসের অভাব নেই যেন আর—সুস্থ হয়ে উঠছে সে আবার।

শহীদ একা নয়, সবাই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল দ্রুত।

কালো ধোঁয়ারাশি বেরিয়ে যাচ্ছে কামরা থেকে। দেখা গেল দরজাগুলো খোলা হয়েছে কখন যেন। হঠাৎ জ্বলে উঠল কামরার আলো।

কুয়াশার শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দুঃখিত। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করা

সম্ভব হলো না।'

রাজকুমারী সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বাঁচলাম কিভাবে! মৃত্যু-রশ্মি ব্যবহার করেছিল শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে···।'

সবাই দেখল কামরার ভিতর কাংকারিয়ার অনুচরদের জ্ঞানহীন দেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

'কাংকারিয়া পালিয়েছে?' কামাল চিৎকার করে জানতে চাইল।

কুয়াশা বলল, 'না।'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল কুয়াশার দিকে। কামরার কোথাও কাংকারিয়া বা শফিকুল কবীরকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ কুয়াশা বলছে পালায়নি···!

কুয়াশা বলল, 'ব্যস্ত হয়ো না। শত্রুরা পালাতে পারেনি। আমাদের জন্য পাতা ফাঁদে তারা নিজেরাই পড়ে মরেছে।'

শহীদ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জানতে চাইল, 'কুয়াশা, মৃত্যু-রশ্মি বা কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডের রহস্যটা কি তা আমি বোধহয় অনুমান করতে পেরেছি। আমার ধারণার কথাটা বলি—ভুল হলে শুধরে দিয়ো।'

মৃদু হাসল কুয়াশা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বুদ্ধিমান। প্রথম থেকেই রহস্যটা সম্পর্কে তুমি মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরেছ, তাই না?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। সাঈদ চৌধুরী একজন রসায়নবিদ। আমার ধারণা তিনি কয়েক ধরনের কেমিক্যাল সংযোগে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন যা যুগান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।'

'কিন্তু জিনিসটা কি?' জানতে চাইল কামাল।

সংক্ষেপে উত্তর দিল শহীদ, 'আমার ধারণা, জিনিসটা অক্সিজেনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। সাঈদা চৌধুরীর আবিষ্কারের নামকরণ করতে পারি আমরা—অ্যান অক্সিজেন ডেস্ট্রয়ার! অক্সিজেনকে গায়েব করে দেবার জন্য একটা কেমিক্যাল ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন তিনি। তুমি কি বলো, কুয়াশা?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।'

শহীদ বলল, 'কুয়াশাও ব্যাপারটা প্রথম থেকেই অনুমান করেছিল। বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি এই অক্সিজেন বিধ্বংসী অস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে সে। এই আবিষ্কারের বদৌলতেই আমরা এখনও বেঁচে আছি, তাই না, কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। প্রথম থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এমন একটা কেমিক্যাল শত্রুরা ব্যবহার করছে যা সাময়িকভাবে বাতাসের অক্সিজেনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রাকৃতিক শত্রু আছে। মি. সাঈদ চৌধুরী অক্সিজেনের শত্রুকে আবিষ্কার করেছেন।'

শহীদ আবার বলতে শুরু করল, 'যুগান্তকারী আবিষ্কার এই কেমিক্যাল বোমার ভিতর ভরে উপর থেকে ফেলা হয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশী জোয়ানরা নিহত হয়। শফিকুল কবীর এই মৃত্যু-রশ্মি ব্যবহার করে কুয়াশার বিরুদ্ধে। কিন্তু কুয়াশা

বেঁচে যায়। তার বাঁচার কারণ সে দীর্ঘক্ষণ দম বন্ধ করে থাকতে পারে।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু শফিকুল কবীর নিজে কেন আক্রান্ত হয়নি?'

শহীদ বলল, 'তার কারণ, শফিকুল কবীরের মুখে ছিল একটা মোটা পাইপ। পাইপটা ধূমপানের জন্য ব্যবহার করত না সে। পাইপের ভিতর ছিল পিওর অক্সিজেন। বুঝতে পেরেছিস কেন সে আক্রান্ত হয়নি?'

ডি. কস্টা হঠাৎ গর্জে উঠল, 'বাট, এনিমিরা কোঠায়? হামি টাহাদেরকে কিছু প্রশ্ন করিটে চাই।'

কুয়াশা বলল, 'প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই তাদের।' কথাটা বলে উন্মুক্ত ম্যানহোলের দিকে এগিয়ে গেল সে।

সবাই তাকে অনুসরণ করল।

নিচের দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল দেওজী কাংকারিয়া এবং শফিকুল কবীরের প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে সিঁড়ির ধাপের উপর।

'শেষবার অক্সিজেন ডেস্ট্রয়ার নিক্ষেপ করে শফিকুল কবীর,' কুয়াশা বলে চলে, 'সে জানত, কাংকারিয়ার কাজ ফুরালে প্রথম সুযোগেই তাকে হত্যা করবে। তাই আমাদেরকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে কাংকারিয়াকেও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কাংকারিয়ার সঙ্গে ম্যানহোলে নামে সে। সিঁড়ির দেয়ালে সুইচ বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? সুইচটা চেপে ধরলেই মৃত্যু-রশ্মি বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরোতে শুরু করে। কাংকারিয়াকে টের পেতে না দিয়ে সুইচটা চেপে ধরে সে। মৃত্যু-রশ্মি এই কামরায় এবং সিঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। শফিকুল কবীর ভেবেছিল এবারও সে তার পাইপের অক্সিজেনের সাহায্যে বেঁচে যাবে। কিন্তু ভাগ্য তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সাঈদ চৌধুরীর গুলি তার গায়ে না লাগলেও তার কোটের পকেটে লেগেছিল লক্ষ করেছিলে তোমরা নিশ্চয়ই? বুলেটটা পকেট স্পর্শ করে ছুটে যাবার সময় পাইপের গায়ে ফুটো করে দেয়। ওই পকেটেই ছিল পাইপটা। ফলে পিওর অক্সিজেনের সরবরাহ পায়নি সে।'

ডি. কস্টা ম্লান কণ্ঠে মন্তব্য করল, 'ব্যাডলাক! পাইপের মধ্যে হোল ঠাকিলে মানুষ মারা যায় হামার লাইফে এমোন কঠা এই ফাস্ট টাইম শুনিলাম।'

সবাই হেসে উঠল তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে।

শহীদ জানতে চাইল, 'খুলনার পুলিসগুলো মরল কিভাবে, কুয়াশা? তুমি ওদেরকে অক্সিজেন ক্যাপসুল খেতে বলনি?'

'বলিনি যে তা নয়। বলেছিলাম যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ক্যাপসুল আনিয়ে নিতে। আনাতে দেরি হয়ে গেলে মাঠের কাছে যাবার দরকার নেই, জানিয়েছিলাম আমি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কেউ আমার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। সেজন্যেই মরতে হলো অতগুলো নিরীহ মানুষকে।'

কুয়াশা ৫৩

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৭৬

এক

বন্দর শহর চট্টগ্রাম। আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। মানুষ-জন যে-যার বাড়িঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ঝড়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করা হয়েছে রেডিও থেকে। নিম্নচাপ ক্রমশ এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে।

নিস্তব্ধ, নিঝুম চারদিক। পথে ঘাটে লোকজন নেই বললেই চলে। রাতও বড় একটা কম হয়নি। এই খানিক আগে নিকটবর্তী একটা গির্জা থেকে রাত এগারোটার ঘণ্টা বেজেছে।

আকাশে মেঘ থাকলেও বাতাস নেই এতটুকু। থমথম করছে পরিবেশটা।

রাস্তাঘাটে কোথাও আলো আছে, কোথাও ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সব শহরের মত, এই বন্দর শহরেও ছিঁচকে চোর-ছ্যাঁচোড়েরা লাইট পোস্ট থেকে বালব্ চুরি করে।

শহরের সবচেয়ে বড় এবং আধুনিকতম হোটেল আগ্রাবাদের সামনে আলোর কোন অভাব নেই। কিন্তু হোটেলের কাছ থেকে সত্তর পঁচাত্তর গজ দূরে আলো একেবারে নেই বললেই চলে। জায়গাটা প্রায় অন্ধকারে ঢাকা।

সেই অন্ধকারে একটি বন্ধ কন্‌ফেক্‌শনারী দোকানের কাঁচের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

আঁধারে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার ডান হাতটা যে বিদঘুটে ভঙ্গিতে নড়ছে সারাক্ষণ তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

অদ্ভুত, ভৌতিক হাত লোকটার। একজন মানুষের হাত ফড়িংয়ের মত দেখতে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও অন্ধকার রাস্তায় অপেক্ষারত লোকটার হাত সম্পর্কে কথাটা সত্যি। হাতটা শুধু দেখতেই ফড়িংয়ের মত নয়, যেভাবে সর্বক্ষণ নড়ছে, বাতাসে ভর দিয়ে উড়ু উড়ু ভঙ্গিতে দুলছে—প্রকাণ্ড একটা উড়ন্ত ফড়িং ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না ওটাকে।

হাতটার রঙও বিচিত্র। লোকটার গায়ের রঙ লালচে। কিন্তু হাতটা সম্পূর্ণ সাদা। অনুজ্জ্বল, লাবণ্যহীন, ফ্যাকাসে ধরনের সাদা। কুৎসিত, ভীতিকর ভঙ্গিতে বাতাসে ভর দিয়ে অবিরাম নড়ছে সেটা। ড্রেনের সাদা একধরনের তুলতুলে সদা-চঞ্চল পোকার কথা মনে পড়ে যায় হাতটার দিকে তাকালেই—গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। দ্রুত, অস্থির ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে। বারবার তাকাচ্ছে পিছন দিকে।

কিন্তু বিপদ পিছনে নয়, অপেক্ষা করছে সামনে।

কনফেক্শনারীর কাঁচের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা তার অস্বাভাবিক বড় বড় চোখ দুটো মেলে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। একজন লোক এদিকে এগিয়ে আসছে, বুঝতে পেরেছে সে। নিঃশব্দে, অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে, প্রায় চোখের পলকে রাস্তার মাঝখানে চলে এল লোকটা।

নবাগত পথিক থমকে দাঁড়াল। সাদা হাতওয়ালা লোকটা তার তিন হাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেল সে। লোকটার একটা হাত বাতাসে ভর দিয়ে উড়ছে দেখেই চিনতে পারল সে মূর্তিমান যমকে। দ্রুত পিছিয়ে গেল সে দু'পা, কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'উলন! আ-আপনি···!'

কিভাবে এগিয়ে এল উলন টের পেল না আতঙ্কিত লোকটা, হঠাৎ সে উলনকে দেখল তার একেবারে আধহাতের মধ্যে। উলনের ডান হাতটা উড়তে উড়তে আরও উপর দিকে উঠে গেল।

মৃত্যুভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল লোকটার চোখ দুটো।

'না···না···আ-আমি···না!'

উলনের ডান হাতটা আরও উপর দিকে উঠছে ক্রমশ। বাঁ হাতটা এতটুকু নড়ছে না, সেটা যেন প্যারালিসিসে আক্রান্ত, নিঃসাড়, অবশ।

হাত দুটোই শুধু নয়, উলনের মধ্যে অস্বাভাবিক আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে। তার চোখ দুটো সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বড় আকারের। চোখের রঙও অস্বাভাবিক রকমের ফ্যাকাসে—প্রায় পানির মত রঙ। মুখটা ছুঁচালো, বড্ড বেশি সরু। রাস্তার দূরবর্তী বাঁকে একটা গাড়িকে দেখা গেল। বাঁক নেবার সময় মুহূর্তের জন্য হেডলাইটের আলো এসে পড়ল উলনের উপর।

রাস্তার উপর উলনের ছায়া পড়ল। ছায়াটা লম্বা, কঙ্কালের মত—অস্বাভাবিক সরু।

উলনের কণ্ঠস্বরটা মৌমাছির গুঞ্জনের মত, পাতলা সিল্কের কাপড় নাড়াচাড়া করলে যেমন নরম শব্দ ওঠে, তেমনি।

'কোথায় সেটা? ইউনুস, চুরি করার মজা দেখাচ্ছি তোকে।'

'আমি জা-জানি না! খোদার ক-কসম···। উলন, বিশ্বাস করুন···!'

উলন শান্তভাবে বলল, 'আমি জানি জিনিসটা তোর কাছেই আছে। কোথায় রাখতে পারিস সেটা, তাও অনুমান করতে পারি। জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিস তুই। জানি, তোদের মহাবীর কুয়াশার কাছে ওটা তুই বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিস। ওটা তোর কোমরে জড়ানো টাকা লুকিয়ে রাখার বেল্টের ভিতর রেখেছিস···।'

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল ইউনুস।

'উলন···ঠি-ঠিক আছে। আসুন, আমরা ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলি! একটা ভু-ভুল করে ফে-ফেলেছি নাহয় আ-আমি···।'

উলনের সাদা ডান হাতটা সর্বক্ষণই বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ধীরে ধীরে, ফড়িংয়ের মত। হঠাৎ সেই হাত বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল।

উলনের হাত ইউনুসকে স্পর্শ করল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু পরমুহূর্তে

তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ইউনুস। পালাতে চাইছে সে। লাফ দিয়ে সরে গেল এক পাশে, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল কন্‌ফেক্‌শনারী দোকানের কাঁচের দেয়ালের উপর।

কাঁচ ভেঙে পড়ল সশব্দে। ইউনুস তার পকেট থেকে রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করছে। অর্ধেক দেহ কন্‌ফেকশনারী দোকানের ভিতর ঢুকে গেছে তার। উন্মাদের মত পা দুটো ছুঁড়ছে দিকবিদিক। এগিয়ে এসে ভাঙা কাঁচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিল উলন। বাঁ হাতটা নিঃসাড় ভঙ্গিতে শরীরের পাশে ঝুলছে। ডান হাত দিয়ে ইউনুসের শার্ট ধরে টান মারল সে। শার্টের দুটো বোতাম ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। প্যান্টের সঙ্গে বাঁধা চওড়া, ফাঁপা বেল্টটা দেখা গেল এবার। সেটা ধরে টান মারল উলন। অসুরের শক্তি উলনের শরীরে। চামড়ার বেল্টটা ছিঁড়ে নিল সে। ইউনুসের পেটে একটা পা তুলে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ফাঁপা বেল্টটার ভিতর থেকে বের করে আনল উলন একটা গগল্‌স্‌।

গগল্‌স্‌টা ভারি অদ্ভুত আকৃতির। যেন দুটো কনডেনস্‌ড মিল্কের পাত্র দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। লেনস দুটোকে ঠিক কাঁচ বলে মনে হয় না। রঙটা ঘন কালো।

উলন গগল্‌স্‌টা চোখে পরল। কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠল তার চেহারা। দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। দ্রুত গগল্‌স্‌টা চোখ থেকে নামিয়ে পকেটে রাখল।

পরদিন সকালের দৈনিক পত্রিকাগুলোয় ইউনুসের মৃত্যু সংবাদ বের হলো।

রাত্রে টহলরত একজন পুলিস কনেস্টবল ইউনুসের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। মৃতদেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন না দেখে তার ধারণা হয়, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল কাঁচের দেয়ালের উপর, মারাত্মক ভাবে জখম হয় সে—মারা যায় সেই জখমের জন্য। পরে, সেই রাতেই, একজন পুলিস বিভাগের ডাক্তারও এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইউনুসের পকেটে একটা রিভলবার ছিল একথা কেউ জানল না। কিন্তু তার বেল্টের ভিতর তিন হাজার টাকা পাওয়া গেল। টাকা পেয়ে থানা কর্তৃপক্ষ ধরে নিল এটা খুন নয়। খুনী খুন করতে পারে টাকার জন্য। টাকা যখন রয়েছে তখন ইউনুস খুন হয়নি।

কিন্তু রাত তিনটের দিকে ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিল। আগ্রাবাদ এলাকার একটা গুদামের নাইটগার্ড থানায় হাজির হলো। কয়েকঘণ্টা চিন্তা করে অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে যা চাক্ষুষ দেখেছে তা পুলিসকে জানাবে।

গোটা ঘটনাটাই পাহারাদার কাছাকাছি থেকে দেখেছিল।

দুই

গতরাতের ঘটনা।

শহরের অভিজাত এলাকার একটি তিনতলা বাড়ি। তিনতলার সুসজ্জিত একটি কামরায় মোটাসোটা মাহবুব উল্লাহ শিকদার সোফায় বসে ভ্যাট 69-এর বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বিড়বিড় করে আপন মনে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি! আসছে না কেন সে!'

বিরাট দেহের অধিকারী মাহবুব উল্লাহ শিকদার। পোশাক-আশাক দামী এবং রুচি সম্পন্ন। তার চেহারা দেখে সন্দেহ করার কোন উপায় নেই যে সে একজন ক্রিমিন্যাল। দুটো জিনিসের প্রতি শিকদারের ভয়ানক দুর্বলতা আছে। ঘড়ি ও মদ। আরও একটা দুর্বলতা আছে শিকদারের। সেটা হলো লোভ। টাকার লোভ দমন করার ক্ষমতা শিকদারের নেই।

চার-পাঁচটা ঘড়ি থাকে শিকদারের পকেটে।

দরজায় করাঘাত হলো। চমকে উঠে মুখ তুলল শিকদার। ঢোক গিলল দ্রুত। বলল, 'ভিতরে এসো।'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল উলন। শিকদার দ্রুত তাকাল উলনের হাতের দিকে। বুকের ভিতর একটা ভয়ের ঢেউ উঠল তার। জোর করে হাসল সে, 'দেরি হলো কেন?'

পকেট থেকে একটা রিভলবার এবং কয়েকটা চকলেট বের করল উলন।

দুটো চকলেট মুখে পুরে চুষতে চুষতে রিভলবারটা শিকদারকে দেখিয়ে জানতে চাইল খসখসে গলায়, 'এটা চিনতে পারো, শিকদার?'

ঝুঁকে পড়ে উলনের হাতের রিভলবারটা দেখল শিকদার। বাঁকা হয়ে গেল মুখটা। বলল, 'ই-ইউনুসের রিভলবার—কিন্তু···!'

উলন অতি শান্তভাবে চকলেট খাচ্ছে। জানতে চাইল, 'এই যে আমি খাচ্ছি—তোমরা এ জিনিসকে কি বলো?'

'চকলেট। কিন্তু ইউনুস···?'

উলন বলল, 'বড় মজার জিনিস তোমাদের এই চকলেট—খেতে বড় স্বাদ। কি যেন বলছিলে? ওঃ, ইউনুস—হ্যাঁ।'

শিকদার ঢোক গিলল। আড়চোখে তাকাল উলনের ডান হাতের দিকে। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তুমি···তুমি ইউনুসকে কি···কি···?'

আরও একটা চকলেট মুখে পুরল উলন। চোখ বুজে চুষতে লাগল সে। তারপর চোখ মেলল, 'কি বললে? ওঃ,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুন করেছি আমি ইউনুসকে।'

'অ্যাঁ! ইউনুসকে তুমি···মানে খুন করেছ? খুন করে···একজন মানুষকে খুন করে তুমি অমন নিশ্চিন্তে চকলেট খাচ্ছ···!'

'দেখো শিকদার, আমি এমন এক জাতির লোক যে জাতির সভ্যতা তোমাদের সভ্যতার চেয়ে কয়েক হাজার বছরের পুরানো।'

'বেশ। বুঝলাম। কিন্তু কি এমন অপরাধ করেছিল ইউনুস?'

'আমাদের পরিকল্পনার কথা সে জানত, এটা তার প্রথম অপরাধ। সে লোভী হয়ে উঠেছিল, এটা তার দ্বিতীয় অপরাধ।'

'লোভী হয়ে উঠেছিল? ইউনুস? কিভাবে বুঝলে?'

উলন চকলেট খেতে খেতে হাসল। বলল, 'তুমি যে যন্ত্রটাকে আমার গগল্‌স্ বলো সেটা ইউনুস চুরি করেছিল। শুধু তাই নয়, সে জানত তোমাদের এই পৃথিবীতে একজন মাত্র মানুষ আছে যে আমার এই গগল্‌স্‌কে ব্যবহার করার চেষ্টা করে সফল হতে পারে। বড় বেশি চালাকি করার চেষ্টা করছিল ইউনুস। আমার গগল্‌স্‌টা চুরি করে সে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল···।'

'বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল! কার কাছে? কে তোমার এই গগল্‌স্ কিনতে চায়?'

উলনের চকলেট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কঠিন হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। বলল, 'ইউনুস কুয়াশার কাছে যাচ্ছিল। কুয়াশার কাছে বিক্রি করার ইচ্ছা ছিল তার গগল্‌স্‌টা···।'

'হোয়াট!'

মদের গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে গেল টেবিলের উপর, ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল সেটা।

উলনের দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে রইল শিকদার। ঘাম ফুটেছে তার কপালে।

উলনের লালচে ত্বকের নিচ থেকে ফুটে বেরিয়ে আসছে নীল রঙের শিরাগুলো। নিশ্চিন্ত মনে চকলেট চুষতে শুরু করেছে আবার সে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় তার মাথার সাদা ধবধবে রেশমের মত চুলগুলো চকচক করছে।

শিকদার ভ্যাট 69-এর বোতলের মুখটা মুখে পুরে ঢক ঢক করে খানিকটা মদ গিলে বলল, 'উলন, বিপদটা কি ঘটতে যাচ্ছিল তা জানো? কুয়াশার নামই শুনেছ তুমি, কিন্তু তার সম্পর্কে কিছুই জানো না? ইউনুসকে শেষ করেছ—খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু, আমি ভাবছি, ইউনুস খুন হবার আগে কুয়াশার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তো?'

'না। তা তোমাদের কুয়াশা খুব ভয়ঙ্কর লোক বুঝি? তার কথা কিছু শোনাও তো?'

শিকদার বলল, 'কুয়াশার গুণের কোন সীমা নেই। এমন হাজার হাজার লোক তুমি খুঁজে পাবে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কুয়াশা এই দুনিয়ার মানুষই নয়। সে নাকি পৃথিবীর মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশি উন্নত এবং আধুনিক অন্য এক দুনিয়ার বাসিন্দা। আবার কেউ কেউ মনে করে সে দেবতা। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, সাইকোলজি এবং এঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে তার মত পণ্ডিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তার শরীরের শক্তি সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শুনেছি আড়াই-তিন হাত মোটা গাছের কাণ্ড দুই হাতে ধরে ভেঙে ফেলতে পারে সে। মোটা কংক্রিটের পিলারকে ভেঙে ফেলতে পারে এক ঘুসিতে।'

'হুঁ। আমাদের মত লোকের জন্য সে কি ভয়ঙ্কর?'

শিকদার বলে উঠল, 'শুধু ভয়ঙ্কর নয়, সাক্ষাৎ যম। তার কাজই হলো সারা পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। তাকে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চারার। তার সহকারী এবং বন্ধু-বান্ধবরাও এক একজন এক একটা প্রতিভা। তাদের সম্পর্কে শোনো, বলি।'

চুপ করে রইল উলন। পকেট থেকে আর একটা চকলেট বের করে মুখে পুরল সে। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে। শিকদারের কথা শুনছে সে একমনে।

গভীর রাত। গোটা শহর ঘুমিয়ে আছে অঘোরে। সবেগে বাতাস বইছে। আকাশের থমথমে চেহারা পাল্টে গেছে। দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে মেঘেরা পুব দিকে।

শিকদার থামতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল উলন। বলল, 'প্ল্যান পরিকল্পনা কেমন এগুচ্ছে?'

শিকদার বলল, 'এগুচ্ছে না।'

উলন বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইল, 'মানে?'

শিকদার বলতে লাগল, 'আমি গত হপ্তায় যে-সব কোম্পানীতে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম সেগুলোর উত্তর পেয়েছি আজ। প্রত্যেকটি এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরীই জানিয়েছে, গোলাকার এয়ারক্রাফট তারা তৈরি করে দিতে পারবে। তাদের তৈরি প্লেন রানওয়ে ছাড়াই সোজা উঠে যাবে, রানওয়ে ছাড়া নামতেও পারবে। কিন্তু প্লেনটা হবে একেবারেই ছোট। বড়জোর দু'জন মানুষ বসতে পারবে তাতে। এবং ফুয়েল থাকবে মাত্র ঘণ্টাখানেক উড়বার মত। তাদের সকলের বক্তব্য, এই ধরনের প্লেন তৈরির ব্যাপারটা এখনও এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে রয়েছে। মোটকথা, ওরা যেগুলো দিতে চাইছে সেগুলোয় কাজ হবে না।'

উলন হঠাৎ হাসল। বলল, 'একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। বুদ্ধিটা কি জানো? কুয়াশার এরকম অত্যাধুনিক আকাশযান আছে। এই আকাশযান নিয়ে ফিরে এসেছে সে কয়েক মাস আগে টুইন আর্থ আনতারা থেকে। আমরা যে ধরনের আকাশযান চাইছি—সেটা হুবহু সেই রকম। শুনেছি, এই রকম স্পেসশিপ তার একটা নয়, দুটো আছে।'

'কি বলতে চাইছ তুমি, উলন?' প্রায় চিৎকার করে উঠল শিকদার।

'বলতে চাইছি, কুয়াশার একটা স্পেসশিপ নেব আমরা।'

শিকদার চিৎকার করে বলল, 'হয় তুমি পাগল হয়ে গেছ, নাহয় ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে। উলন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বলছ কি! আমি তো গোটা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়তে রাজি আছি প্রাণ বাঁচাবার জন্য···কিন্তু কুয়াশার বিরুদ্ধে লড়তে রাজি নই।'

'তুমি ভয় করতে পারো, করা উচিতও। সত্যিই কুয়াশা অপরাজেয়। কিন্তু আমি কাউকে ভয় করি না। সে আমার ক্ষমতার প্রমাণ পেলে ভাল মানুষের মত সরে দাঁড়াবে। যদি সরে না দাঁড়ায়, বোকামি করবে। আমার ক্ষমতা এমনই, তুমি

তো কিছুটা জানো। যে কোন মানুষকে হত্যা করতে পারি চোখের পলকে—তাই না? কুয়াশা যদি ভালয় ভালয় সরে না দাঁড়ায় আমার রাস্তা থেকে—করার কিছু নেই, মরতে হবে তাকে।'

কথাগুলো বলে ঘুরে দাঁড়াল উলন। ধীর পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে বারান্দায় পা দেবার পূর্ব মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শিকদারের দিকে, 'আমি যাচ্ছি।'

ব্যাকুল কণ্ঠে পিছু ডাকল শিকদার, 'উলন! উলন! উলন, শোনো!'

কিন্তু উলন শিকদারের ডাক শুনেও শুনল না।

আধঘণ্টা পর দেখা গেল একটা ডিঙি নৌকায় একা বসে বৈঠা চালিয়ে কর্ণফুলী নদীর উপর দিয়ে এগুচ্ছে উলন।

চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার। নদীর কলকল ধ্বনি ছাড়া শব্দ নেই কোথাও।

মিনিট পনেরো বৈঠা চালাবার পর সুউচ্চ একটা পাঁচিলের গায়ে নৌকা ঠেকাল উলন। পাঁচিলটা সোজা উঠে গেছে নদী থেকে। প্রায় দুই আড়াই মানুষ সমান উঁচু হবে পাঁচিল।

পাঁচিলটা বহুকালের পুরানো। প্লাস্টার খসে পড়েছে, খসে পড়েছে এখান সেখান থেকে এক আধটা ইঁট। ছোটখাট গর্ত দেখা যাচ্ছে পাঁচিলের গায়ে। সেই সব গর্তে বিষাক্ত সাপ থাকাও বিচিত্র নয়।

প্রকাণ্ড একটা বিল্ডিংয়ের পিছন দিকের পাঁচিল এটা। পিছন দিকটা পুরানো এবং একতলা হলেও সামনের দিক পাঁচতলা উঁচু এবং অত্যাধুনিক আর্কিটেকচারের সাক্ষ্য বহন করছে।

একটা কাঠের খুঁটি তুলে নিল উলন নৌকার পাটাতন থেকে। সেটা পুরানো পাঁচিলের একটা গর্তে ঢুকিয়ে দিল সজোরে। সেই খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে নৌকাটা বাঁধল সে। তারপর পাঁচিলের গর্তে পা দিয়ে দিয়ে বিড়ালের মত উপর দিকে উঠতে শুরু করল।

দেখতে কঙ্কালের মত হলেও উলনের শরীরে অসাধারণ শক্তি আছে। গর্তগুলোয় হাত-পা রেখে দ্রুত উঠে যেতে লাগল সে।

পাঁচিলের একেবারে উপর দিকে একটা বড় আকারের ভেন্টিলেটার দেখা যাচ্ছে। সেই ভেন্টিলেটারের কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল উলন। ভেন্টিলেটারটায় লোহার শিক লাগানো। ভিতরটা অন্ধকার। উলন এক হাত দিয়ে শিকগুলো ধরে টানতে লাগল। ভেন্টিলেটারের লোহার শিকগুলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খুলে এল উলনের হাতে। ভেন্টিলেটারের জায়গায় একটা বড়সড় ফাঁকের সৃষ্টি হলো। অনায়াসে দেহটা সেই ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে এখন উলন। ফাঁকের ভিতর মাথাটা গলিয়ে দিল সে।

ছাদের উপর থেকে একটা হাত নেমে এল এমন সময়। ফর্সা, গোলাকার নরম একটা হাত। উলনের ঘাড় ধরে ফেলল সেই মেয়েলি হাতটা। ঘাড় ধরে টানতে লাগল উলনকে উপর দিকে।

উলনের মাথাটা বেকায়দা ভাবে আটকে গেল ফাঁকের মধ্যে। আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা রহস্যময় ভঙ্গিতে ফড়িংয়ের মত সামনে পিছনে উড়তে শুরু করেছে। কিন্তু হাতটা অন্য কাজে লাগাতে বাধ্য হলো উলন। দেহটাকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্য পাঁচিলের একটা গর্ত আঁকড়ে ধরল সে।

কিন্তু নরম, ফর্সা হাতটা তাকে টানছে তো টানছেই। ফড়ফড় শব্দে ছিঁড়ে গেল উলনের গায়ের শার্ট। শূন্যে ঝুলতে লাগল তার দেহটা।

ফর্সা হাতটা ধরে আছে উলনের ঘাড়। ঘাড় ধরেই উলনকে ছাদের উপর তুলে নিল হাতটা।

দুই হাত দূরে জ্বলে উঠল একটা টর্চ।

শোনা গেল একটা ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো!'

তিন

টুইন আর্থের রাজকুমারী অর্থাৎ কুয়াশার বান্ধবী ওমেনা বলে উঠল, 'মি. ডি. কস্টা, লোকটা কিন্তু হুবহু পাটখড়ির মত, মানে অনেকটা আপনারই মত রোগা পটকা!'

ডি. কস্টা মুচকি মুচকি হাসছিল। রাজকুমারীর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল সে। হাতের লম্বা, সরু ছড়িটা ঘোরাল বাতাসে। উলনের পিঠে ছড়িটার ডগা চেপে ধরল। বলল, 'হ্যালো!'

উলন চোখ পিটপিট করে দেখছে ডি. কস্টাকে। কথা বলে উঠল সে খসখসে, কিন্তু একেবারে শান্ত ভাবে, 'তুমি কুয়াশার সহকারী, ডি. কস্টা, তাই না?'

ডি. কস্টা উত্তর না দিয়ে তাকাল রাজকুমারীর দিকে, 'ডেকুন টো মিস ওমেনা, হারামজাডার কাছে আর্মস-অ্যামুনেশন রহিয়াছে কিনা।'

দ্রুত সার্চ করল রাজকুমারী। উলনের পকেট থেকে বের করল সে গগল্‌স্‌টা। বলল, 'আর কিছু নেই। কিন্তু এটা কি জিনিস বলুন তো?'

উলন উঠে বসার চেষ্টা করল। ডি. কস্টার কালো রঙের ছড়িটা চেপে বসল উলনের পিঠে।

'বোটাম টিপিয়া ডিব কিন্তু!'

স্থির হয়ে গেল উলনের দেহ। ডি. কস্টা সম্পর্কে সে সব কথাই জানে, জানে তার এই কালো ওয়াকিং স্টিকটি সম্পর্কেও। ছড়িটার ডগার ভিতর লুকানো আছে ক্ষুদ্র একটা সুচ। সুচের মাথায় মাখানো আছে মারাত্মক বিষ। ছড়ির মাথায় আছে একটি ছোট্ট বোতাম। সেই বোতামে চাপ দিলেই বিষ মাখানো সুচটা বেরিয়ে প্রবেশ করবে শরীরে। মৃত্যু ঘটবে মুহূর্তের মধ্যেই।

'তুমি রাজকুমারী ওমেনা, তাই না?' উলন আবার কথা বলে উঠল।

ডি. কস্টা খেঁকিয়ে উঠল, 'টুমি কে?'

উলন শান্তভাবে হাসল। জানতে চাইল, 'তোমরা টেরপেলে কিভাবে আমার আগমন?'

এবার হাসার পালা ডি. কস্টার। এক গাল হেসে সে বলল, 'যাদু জানি, যাদু! হামাডেরকে না জানাইয়া একটি পিঁপড়াও এই বিল্ডিংয়ে ঢুকিটে পারে না। হামাডের অ্যালার্মিং সিস্টেম অটুলনীয়।'

উলন বলে উঠল, 'ও, সত্যি ভুল হয়েছে আমার। তোমাদের ফটো-ইলেকট্রিক আই আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে ভাবা উচিত ছিল আমার।'

রাজকুমারী বলল নীচু গলায়, 'ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখো দেখছি!'

উলনের ডান হাতটা ছাদের মেঝে থেকে উপরে উঠল কয়েক ইঞ্চি, ফড়িংয়ের মত ওড়ার ভঙ্গিতে একবার পিছিয়ে যাচ্ছে হাতটা, একবার সামনে এগুচ্ছে।

'মাই গড! হোয়াইট হ্যাণ্ড!'

উলনের সাদা হাত দেখে বিমূঢ় হয়ে উঠল ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী। উলন ঠিক সেই সময় তার মাথাটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ডি. কস্টার পায়ের আঙুলের উপর রাখল, চাপ দিতে লাগল মাথা দিয়ে আঙুলের উপর।

তীব্র ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল ডি. কস্টা। তার হাতের ছড়িটা সরে গেল উলনের পিঠ থেকে।

উলন এই সুযোগে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেগে উড়তে শুরু করল তার ডান হাতটা বাতাসে ভর দিয়ে।

রাজকুমারী পিছিয়ে গেল একপা। দ্রুত বলে উঠল, 'মি. ডি. কস্টা, সাবধান! এ কোন সাধারণ লোক নয়।'

ডি. কস্টাও পিছিয়ে গেল এক পা।

'টাই টো! মানুষের মটো ডেকিটে, বাট মানুষ নয় মোটেই। ডেকুন মিস ওমেনা, ব্যাটার চোক ডুটো কটো বড় বড়। ডেকুন গায়ের রঙটা কেমন আগুনের মটো রেড! ডেকুন হাটের ডিকে টাকিয়ে—হোয়াইট! ফ্লাইং হ্যাণ্ড! ডেকুন মাঠার ডিকে টাকিয়ে—চুলগুলো কেমন ব্রাইট অ্যাণ্ড হোয়াইট···।'

ডি. কস্টাকে সাবধান করে দিয়ে, প্রায় চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী, 'সাবধান! ওর হাতের মুঠোয় কি যেন রয়েছে!'

লাফ দিয়ে উলনের বাঁ পাশে চলে গেল ডি. কস্টা। উলন তাকিয়ে ছিল রাজকুমারীর দিকে, তাই ডি. কস্টার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহটা ঘুরিয়ে নিতে পারেনি সে। দেহটা সে ঘোরাল ঠিকই কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ডি. কস্টা উলনের ঘাড়ের মাংসে হাতের ছড়ির ডগাটা চেপে ধরেছে।

বিপদ টের পেয়ে স্থির হয়ে গেল উলন। তার ডান হাতটা ধীরে ধীরে ফিরে এল দেহের পাশে, স্থির হয়ে গেল সেটাও।

উলন তিক্ত হাসল। বলল, 'আমি জানি, মেরে ফেলতে পারবে না তুমি আমাকে। মেরে ফেলার আগে তোমার বসের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে তুমি—ঠিক বলিনি?'

'শাটআপ! ইউ, শয়টান! হাটের মুঠো খোলো—কুইক!'

ঘাড়ে ছড়ির ডগা চেপে বসল আরও। উলন তাড়াতাড়ি ডান হাতের মুঠো খুলল।

ওরা দু'জনই দেখল, উলনের হাতে কিছু নেই।

রাজকুমারী উলনের পকেট থেকে পাওয়া গগল্‌স্‌টা চোখের সামনে ধরে বলে উঠল, 'কি রকম গগল্‌স্‌ এটা? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?'

উলন কথা বলল না।

'কেন এসেছ তুমি এখানে? কে তুমি?'

রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে আছে উলন। কথা বলল না সে।

ডি. কস্টা বলল, 'বসের নিকট লইয়া যাইটে হইবে ব্যাটাকে। কিন্টু, টার আগে, এই ব্যাটা হাফ ম্যান, মাঠার উপর হাট ডুটো টুলিয়া ঢরো!'

পাঁচতলা বিল্ডিংটা কুয়াশার নিজের হলেও গ্রাউণ্ড ফ্লোর সহ থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেয়া হয়েছে। ফোর্থ ফ্লোরটা সম্পূর্ণ নিজের কাজে ব্যবহার করে কুয়াশা। চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় আস্তানা তার এটা।

পাঁচতলায় কামরার মোট সংখ্যা একুশ। নিজস্ব আলাদা এলিভেটর আছে তার পাঁচতলায় ওঠার জন্য। সাধারণত কুয়াশা ছাড়া সেটা অন্য কেউ ব্যবহার করে না।

উলনকে পাঁচতলায় নিয়ে যাওয়া হলো কুয়াশার ব্যক্তিগত এলিভেটরের সাহায্যে।

প্রশস্ত করিডর ধরে এগিয়ে চলল ওরা। একটি দরজার সামনে দাঁড়াল রাজকুমারী। দরজার গায়ে ছোট্ট একটা নেমপ্লেট। পিতলের অক্ষরে বাংলায় লেখা: ড. মনসুর আলী।

কুয়াশার প্রকৃত নাম ওটা।

উলনও দাঁড়াল। উলনের পিছনে রয়েছে ডি. কস্টা। তার হাতের ছড়ির ডগাটা উলনের শিরদাঁড়ার উপর চেপে বসে আছে। উলন একটু নড়াচড়া করলেই ডি. কস্টা আরও চেপে ধরছে ছড়ির ডগাটা।

চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল রাজকুমারী।

বড় আকারের, অত্যাধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একটা কামরার ভিতর ঢুকল ওরা। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা বড় আকারের রেডিও থেকে ঘোষণা হচ্ছে: টহলদানরত সব পুলিস-কারকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে। জিঞ্জির খান জেল থেকে পালিয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে শহরেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে সে। শহর থেকে পালাবার চেষ্টা করবে। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সে যেন কোনমতেই শহর ছেড়ে পালাতে না পারে। জিঞ্জির খানের চেহারার বর্ণনা এইরকম, প্রকাণ্ডদেহী সে। চুল কালো, চোখ দুটো কালো। মুখে তিনটে ক্ষতচিহ্ন আছে। ভয়ঙ্কর বেপরোয়া লোক সে। ডান পা-টা সামান্য খোঁড়া। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে…।

ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে পুলিস কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়্যারলেসের সাহায্যে। পুলিসকারগুলোর উদ্দেশ্যে। কুয়াশা তার নিজস্ব রেডিওতে জরুরী ঘোষণাগুলো নিয়মিত শোনে। অপরাধীদের গতিবিধি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারে সে

এইভাবে।

রেডিওর শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল ডি. কস্টার কণ্ঠস্বর, 'বস্! প্লীজ একবার এই রুমে পদার্পণ করুন। এক ব্যাটাকে হামরা পাকড়াও করিয়াছি স্পেসক্রাফটের হ্যাঙ্গারের নিকট হইটে। রিভার সাইডের ডেয়াল···।'

কুয়াশা হাতে ধূমায়িত পাইপ নিয়ে একটি দরজা পেরিয়ে কামরায় প্রবেশ করল।

উলন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুয়াশার দিকে। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ কুয়াশাকে দেখে তার চোখ দুটো কুঁচকে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুয়াশার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে সে। সাধারণ কোন মানুষের সঙ্গে এ লোকের কোন তুলনা হয় না, বুঝতে পারল সে। কুয়াশার চোখ দুটোর দিকে তাকাল বটে সে কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ সরিয়ে নিল সে দ্রুত। কুয়াশার চোখ দুটোয় যেন যাদু আছে। চোখ দুটোর দৃষ্টি এমনই অদ্ভুত, যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে ফেলছে তার। এ চোখ সম্মোহন করার চোখ, বুঝতে পারল উলন।

কালো সিল্কের আলখেল্লা পরে আছে কুয়াশা।

রাজকুমারী সম্পূর্ণ ঘটনাটা ব্যক্ত করল নিচু গলায়। কথা শেষ করে কুয়াশার হাতে তুলে দিল সে রহস্যময় গগল্‌স্‌টা।

গগল্‌স্‌টা নিয়ে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করল কুয়াশা। পরীক্ষা করতে করতে বারবার তাকাল মেঝেতে বসা উলনের দিকে। গগল্‌স্‌টা চোখে পরল কুয়াশা একবার। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ থেকে নামিয়ে নিল সেটা। ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল যেন। তাকাল উলনের দিকে আবার।

'কি এটা?'

উলন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'খেলনা। মূল্যহীন, গুরুত্বহীন, বাচ্চাদের একটা খেলনা ওটা।'

কুয়াশা কি মনে করে আপনমনে মাথা নাড়ল। তারপর জানতে চাইল, 'কি মনে করে তুমি স্পেসক্রাফট হ্যাঙ্গারের কাছে এসেছিলে?'

উলন হঠাৎ হাসল। হাসলে তাকে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর দেখায়। বলল, 'খুলেই বলি। বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ—আপনি আমার মত একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন না এই ভেবে আমি নদীপথে নৌকা নিয়ে আপনার আস্তানায় ঢোকার চেষ্টা করি। আমি জানতাম আপনার অ্যাল্যার্মিং সিস্টেমে আমার অনুপ্রবেশ ধরা পড়বে, আপনার লোকেরা আমাকে ধরবে এবং আপনার কাছে হাজির করবে। আপনার দেখা পাবার এটাই একমাত্র উপায়—ভেবেছিলাম আমি।'

ডি. কস্টা গর্জে উঠল, 'লায়ার!'

কুয়াশা কথা না বলে তার হাতের গগল্‌স্‌টার দিকে আবার তাকাল। আবার তার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

এদিকে রেডিও থেকে তখনও ঘোষণা প্রচারিত হচ্ছে। জিঞ্জির খানের চেহারার

বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। প্রকাণ্ডদেহী সে। চুল কালো, চোখ দুটো কালো। মুখে তিনটে ক্ষতচিহ্ন আছে। ভয়ঙ্কর বেপরোয়া লোক সে…।

রেডিওর শব্দ ম্লান হয়ে গেল কুয়াশা ভরাট গলায় কথা বলে উঠতে। 'কে তুমি?'

উলন উত্তর দিল, 'ইকবাল আহমেদ আমার নাম। তবে তাইওয়ানে আমাকে লোকে চেনে চেংফাঙ নামে।'

কুয়াশার মুখের চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না।

উলন আবার কথা বলে উঠল, 'জানি আপনি কি ভাবছেন, মি. কুয়াশা। পুরোপুরি বাঙালীদের মত দেখতে নই আমি। তার কারণ, আমি জন্মসূত্রে চাইনীজও। আমার বাবা বাঙালী ছিলেন, কিন্তু মা চাইনীজ। আর একটা কথা। দু-ধরনের রক্ত মিশ্রণের ফলে আমার চেহারা এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তা নয়। আমি কঠোর পরিশ্রম করে, কল্পনাতীত বিপদের মধ্যে থেকে বেঁচে এসেছি। এমন সব ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলাম আমি, এমন সব যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে আছি আমি—আর কোন মানুষ হলে একবার নয়, হাজারবার মরে যেত।'

'বলে যাও।'

বলে চলল উলন, 'কেউ বিশ্বাস করবে না বলে আমার অতীতের কথা আমি কাউকে বলতে চাই না। কিন্তু আপনাকে আমি সব কথা বলতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, খালি চোখে আমরা যা দেখি তাছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে যে-সব জিনিসকে অগ্রাহ্য করা চলে না, যে-সব জিনিসের ক্ষমতা, শক্তি সম্পর্কে কারও কোন রকম সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাই না? মি. কুয়াশা আপনি কি অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন?'

উলন প্রশ্নটা করে মুহূর্তের জন্য থামল। কুয়াশা উত্তর দিল না দেখে আবার বলতে শুরু করল সে, 'আপনি নিশ্চয়ই আইস অভিযানের কথা শুনেছেন? নর্থ কানাডার প্যাক আইসে অভিযাত্রী দলটা নিখোঁজ হয়ে গেছে, তাই না? আমি, ইকবাল আহমেদ সেই অভিযাত্রী দলের একমাত্র সদস্য, যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি। কয়েক মাস আগে, আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, আমি প্লেন নিয়ে নর্থ কানাডায় যাই নিখোঁজ অভিযাত্রী দলটিকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে মহাবিপদে পড়ি। কোন প্লেনকে সেখানে ল্যাণ্ড করানো সম্ভব নয়। বরফ ছাড়া আর কিছুই নেই এলাকাটায়। এয়ারক্রাফট কোম্পানীগুলো যে ধরনের প্লেন তৈরি করছে সেগুলো দিয়ে কাজ হবে না। হারানো অভিযাত্রী দলটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হলে দরকার অন্য ধরনের আধুনিক স্পেসক্রাফট। সে ধরনের স্পেসক্রাফট একমাত্র আপনার কাছেই আছে।'

'বলে যাও।'

উলন বলল, 'আপনার স্পেসক্রাফটটা ধার চাইব বলেই আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি আমি। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে।'

'কি সেটা?'

উলন একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষ আপনি। আপনার জ্ঞান-গরিমার তুলনা হয় না। মি. কুয়াশা, আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।'

উলন থামতেই রাজকুমারী জানতে চাইল, 'কুয়াশা, আইস অভিযান—কথাটা কি বানানো?'

কুয়াশা বলল, 'না। পেপারে খবরটা বেরিয়েছিল। কিন্তু খবরটার মধ্যে আরও কিছু তথ্য ছিল। অভিযাত্রী দলের লীডারের নাম ছিল প্রফেসর স্টিভেনসন। কানাডিয়ান।'

উলন দ্রুত জানায়, 'খবরের কাগজে তো এ কথাও লেখা হয়েছিল যে আইস অভিযাত্রীরা সাধারণ কোন বিপদে পড়ে হারিয়ে যায়নি, তারা হারিয়ে যায় অলৌকিক একটা বিপদে পড়ে···।'

সবাই চুপ করে রইল। এমন কি, কুয়াশার চোখেও প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

উলন নড়েচড়ে বসল, 'বলি তাহলে। আমরা নর্থ কানাডার বরফাচ্ছাদিত জগতে যে রসহ্যময় জিনিসের দেখা পাই তার নাম—কি বলব—কি বলব—"জিনিস" বলাই ভাল তাদেরকে। জিনিসগুলো আসত রাতের অন্ধকারে। সেগুলো আকারহীন···আর ভয়ঙ্কর। জিনিসগুলো আসত রাতে—আমাদের একজন করে লোককে নিয়ে যেত তারা প্রতিবার। আমাদের মধ্যে একজন করে কমতে লাগল লোক। তারপর, আমি পালালাম···একমাত্র আমিই শেষ পর্যন্ত পালাতে পারি।'

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'স্টিভেনসনের আইস অভিযানে তুমি ছিলে, বলছ। কোনও প্রমাণ দেখাতে পারো?'

উলন বলল, 'না। তেমন কোন প্রমাণ আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারব না। কিন্তু চেষ্টা করলে আপনি আমার দাবির সত্যতা যাচাই পারবেন। কানাডা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন আমি আইস অভিযানের সদস্য ছিলাম কিনা। ব্যাপারটা খুলেই বলি। আইস অভিযানে যোগ দিয়েছিলাম অনেকটা ঘটনাচক্রে। কানাডায় পড়াশোনা করছিলাম আমি। স্টিভেনসন ভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন তিনি আমাকে। কথায় কথায় একদিন তিনি তাঁর অভিযানের কথা বললেন। আমাকে উৎসাহী দেখে তিনি অভিযানে যোগ দেবার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটা আমি সানন্দে গ্রহণ করি।'

চার

থামল উলন, আবার শুরু করার আগে কুয়াশার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইছে সে তার গল্পটা কিভাবে গ্রহণ করছে।

রাজকুমারী এবং ডি. কস্টার চোখেমুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠলেও কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল না তার মনের কথা।

এদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপরের রেডিওটা থেকে নতুন একটা ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে তখন: জরুরী ঘোষণা! সকল টহলদানরত পুলিস কারের প্রতি জরুরী বেতার বার্তা! ইউনুস নামক একজন লোককে অস্বাভাবিক রোগা, সাদা হাত এবং সাদা চুলওয়ালা একজন লোক খুন করে পালিয়ে গেছে। খুনীর চেহারাটা খুবই অসাধারণ। বেশ লম্বা সে, প্রায় ছয় ফুটের মত। খুনীর পরনে নীল রঙের সার্ট এবং গ্যাবার্ডিনের সাদা প্যান্ট···।

ডি. কস্টা উলনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে গর্জে উঠল, 'ব্যাটা পাকা খুনী অটিশয়!'

সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে কুয়াশা। যে ভাষা একমাত্র তার সহকারীরা ছাড়া আর কারও বোঝার সাধ্য নেই। কুয়াশা যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, 'পালাচ্ছে লোকটা! সাবধান! খুব সাবধান! আটকাতে হবে ওকে, কিন্তু সাবধানে এগোও।'

চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে উলন ইতিমধ্যে।

ধাওয়া করল কুয়াশার নির্দেশ পেয়েই রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা।

এরপরই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা দু'জন দু'দিক থেকে ছুটে গেল উলনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে উলনের কাছে পৌঁছে গেল তারা। উলনের কোন উপায় নেই। ধরা পড়েই গেছে সে বলতে গেলে। কিন্তু এক সেকেণ্ডেরও অল্প সময়ের মধ্যে উলন ওদের দু'জনের হাতের আওতা থেকে সরে গেল। সরে যাবার আগে চিলের মত ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সে ডি. কস্টার হাতের ছড়িটা, দুই হাতে ধরে মট্ করে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলে দিল সেটাকে টেবিলের নিচে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এত অল্পসময়ে কেউ, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—কল্পনা করাই কঠিন। উলনের শরীর যেন বিদ্যুতের মত, পলক ফেলার আগে সরে যাচ্ছে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়।

ব্যাপারটা লক্ষ করে কুয়াশাও বিস্মিত না হয়ে পারছে না। আলখেল্লার পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে। কিন্তু একান্ত প্রয়োজন না হলে গুলি করবে না সে। লোকটাকে জীবিত বন্দী করতে চায়।

উলনকে হাতের আওতায় পেয়েও স্পর্শ করতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা। কুয়াশা একলাফে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে।

উলনের বেরিয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ।

রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা আবার এগোল উলনের দিকে। এবার ধীরে ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে।

'ব্যাটার দেহটা ইলেকট্রিসিটি ডিয়ে টৈরি, আই গেস!' ডি. কস্টা সন্দিহান কণ্ঠে বলে উঠল।'

উলনও এবার এগিয়ে আসছে ওদের দু'জনের দিকে। তার ডান হাতটা বাতাসে ভর দিয়ে ফড়িংয়ের মত থেমে থেমে উড়তে শুরু করেছে এতক্ষণে

আবার।

কুয়াশা অকস্মাৎ বলে উঠল, 'সাবধান! পিছিয়ে যান, মি. ডি. কস্টা!'

পিছিয়ে এল ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী। কিন্তু উলন থামল না, এগিয়ে আসছে সে দ্রুত। তার ডান হাতটা বাতাসে ভর দিয়ে নাচছে অবিরাম, অবিরত। হঠাৎ আবার সেই কল্পনার অতীত গতিতে লাফ দিল, চোখের পলকে রাজকুমারী ওমেনার সামনে চলে এল সে। তার ডান হাতটা উপর দিকে উঠল, রাজকুমারীর ঘাড়ের দিকে হাতটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে। কুয়াশা দরজার কাছ থেকে এক লাফে চলে এসেছে ইতিমধ্যে রাজকুমারীর পাশে। সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে ওমেনাকে, নিজেও লাফ দিয়ে সরে গেল উলনের কাছ থেকে দূরে।

কুয়াশার ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেছে রাজকুমারী।

উলন এবার ছুটে গেল ডি. কস্টার দিকে। কুয়াশা লাফিয়ে গিয়ে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মারল উলনের ডান পাশের কোমরে।

হালকা দেহটা কুয়াশার লাথি খেয়ে শূন্যে উঠে গেল, ছুটে গিয়ে ধাক্কা খেলো দেয়ালের গায়ে, দেয়াল থেকে পড়ল মেঝেতে। পরমুহূর্তে স্প্রিংয়ের মত মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল উলন। সেই অবিশ্বাস্য বেগে আবার ছুটল সে আক্রমণ করতে। তার ডান হাত আগের মতই রহস্যময়, ভীতিকর ভঙ্গিতে বাতাসে ভর দিয়ে উড়ছে।

এরপর যা ঘটতে লাগল তা এককথায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। প্রশস্ত কামরার ভিতর যেন কয়েক শত দৈত্যদানব হিংস্র আক্রোশে লাফালাফি করছে।

উলন প্রতি সেকেণ্ডে আক্রমণ করছে তিনজনের একজনকে। কুয়াশা বিদ্যুতের মত ছুটোছুটি করে রক্ষা করার চেষ্টা করছে ওমেনা এবং ডি. কস্টাকে—নিজেকেও।

'রাজকুমারী! হুঁশিয়ার! কাউকে যেন স্পর্শ করতে না পারে ও।'

আতঙ্ক, ভয় বলে কোন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত নয় ওরা। কিন্তু আজকের মত বিপদে এর আগে পড়েনি কেউ। ডি. কস্টার চোখ দুটো ডিমের মত বড় বড় হয়ে গেছে। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে তার সরু মুখটা।

রাজকুমারী ঘামছে দরদর করে। সাবসোনিক রেডিয়েশন নামক ব্যক্তিগত অস্ত্রটা ব্যবহার করার সুযোগও পাচ্ছে না সে। এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হলে কিছু সময় দরকার।

উলন খসখসে গলায় কথা বলে উঠল হঠাৎ, 'আমার গগল্‌স্! দিয়ে দাও ওটা, নয়তো তোমাদের সবাইকে খুন করে ফেলব আমি!'

কুয়াশার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

সে কথা বলে উঠল সাঙ্কেতিক ভাষায়। কামরার দুই কোণায় সরে গেল রাজকুমারী আর ডি. কস্টা।

কুয়াশা হাত দিল আলখেল্লার পকেটে। হাতটা বেরিয়ে এল, গগল্‌স্‌টা দেখা গেল তার হাতে। উলনের দিকে ছুঁড়ে দিল সে গগল্‌স্‌টা।

শূন্য থেকে লুফে নিল গগল্‌স্‌টা উলন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঠন্ করে কাঁচ ভাঙার একটা শব্দ হলো।

হঠাৎ উলনের পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটুর কাছে। শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। স্থির, নিঃসাড় হয়ে গেছে কঙ্কালসার দেহটা। দেখে মনে হয়—খতম হয়ে গেছে উলন।

নড়ল না কেউ। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন।

ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। দীর্ঘ পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল একটা জানালার সামনে। জানালাটা খুলে দিয়ে ফিরে এল সে উলনের নিঃসাড় দেহের কাছে। হাঁটু ভাঁজ করে বসল সে দেহটার পাশে।

খানিক আগে কুয়াশা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গার মেঝেতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দেখা গেল।

পকেট থেকে উলনের গগল্‌স্‌টা বের করার সময় কুয়াশা সেই সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র কাঁচের অ্যানেসথেটিক বম্ব বের করে এনেছিল। গগল্‌স্‌টা উলনের দিকে ছুঁড়ে দেবার সময় হাতের বোমাটা মেঝেতে ফেলে দেয় সে। তার আগে সাঙ্কেতিক ভাষায় রাজকুমারী এবং ডি. কস্টাকে দম বন্ধ করে থাকার নির্দেশ দেয়।

বিষাক্ত গ্যাসটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। ছড়িয়ে পড়বার সময় কেউ যদি শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে ফুসফুসে এই গ্যাস গ্রহণ করে, জ্ঞান হারাবে সে। কমপক্ষে দু'ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকতে হবে তাকে। এই গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাজা বাতাসের সংস্পর্শে আসার খানিক পরই এর কার্যক্ষমতা লোপ পায়।

কথা বলে উঠল ডি. কস্টা, 'লোকটা—গড নোজ হোয়েদার হি ইজ এ ম্যান অর নট—পালাইবার সুযোগ পাইয়াও পালায় নাই! গগল্‌স্‌টা রিটার্ন লইবার জন্য সে…।'

কুয়াশা উলনের পাশে বসে তাকে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হাত বাড়াল সে উলনের ডান হাতটা ধরার জন্য।

বিদ্যুৎবেগে, চোখের পলকে, উঠে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল উলন। তার ডান হাতটা দুলছে, নাচছে। হঠাৎ সেই হাত কব্জির কাছে ভাঁজ হয়ে গেল। হাড্ডিসার আঙুলগুলো লোহার শিকের মত দেখাচ্ছে। ভঙ্গিটা সাপের ফণার মত। সেই সাপের ফণার মত হাতটা ছোবল মারল কুয়াশার ঘাড় লক্ষ্য করে।

গ্যাসের প্রভাব মুক্ত হয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে উলন। কুয়াশা এ ন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় অবাক না হয়ে পারল না। উলনকে উঠে দাঁড়াতে দেখেও নড়ল না সে। কিন্তু উলনের ডান হাতটা সবেগে ঘাড়ের উপর নেমে আসছে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল সে। সরে গিয়েই রিভলবার তুলল গুলি করার জন্য।

চোখের পলকে চলে এল উলন তার সামনে। কুয়াশা বসে পড়ল ঝট করে। উলন ডান হাতটা দিয়ে আবার ছোবল মারল। কুয়াশাকে স্পর্শ করতে না পারলেও তার হাতের রিভলবারটা এক ঝটকায় কেড়ে নিল। রিভলবারটা হাত ছাড়া হয়ে যেতে কুয়াশা বিদ্যুৎবেগে সামনে এগোল, ডান পাটা বাড়িয়ে দিল সে। ছিটকে পড়ল উলন, তার হাতের রিভলবারটা ছুটে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল সোফার নিচে।

উলনকে ল্যাং মেরে কুয়াশা সরে গেছে কামরার এক প্রান্তে। উঠে দাঁড়িয়ে

আবার উলন এগিয়ে আসছে। এবার ধীরে ধীরে। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি সে তার গতির খেলা দেখাবে।

লাফ দিয়ে রাজকুমারী আর ডি. কস্টার কাছে চলে গেল কুয়াশা। দুই হাত দিয়ে দু'জনকে ধাক্কা মারল সে।

কঠোর আদেশের মত শোনাল কুয়াশার কণ্ঠস্বর, 'মি. ডি. কস্টা, পাশের কামরায় চলে যান। রাজকুমারী, তুমিও! কুইক!'

'কিন্তু কুয়াশা···!'

কুয়াশার ধাক্কা খেয়ে তাল সামলাতে সামলাতে রাজকুমারী বলল।

'কুয়াশা···।'

হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল কুয়াশা ওদের দু'জনকে। কিন্তু দু'জনের কারও মধ্যেই নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। কুয়াশাকে একা এই ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলে রেখে পালাতে রাজি নয় ওরা।

টের পেয়ে কুয়াশা পিছিয়ে এল খানিকটা। উলনের দিক থেকে চোখ সরায়নি সে মুহূর্তের জন্যও।

দু'দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজকুমারী এবং ডি. কস্টাকে ধরল কুয়াশা। পাশের কামরায় ঢোকার দরজার দিকে ঠেলে দিল দু'জনকে। সেই সঙ্গে হাতের গগল্‌স্‌টা পাশের কামরার দিকে ছুঁড়ে দিল।

সবেগে দরজা টপকে পাশের কামরার মেঝেতে গিয়ে পড়ল দু'জন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ওরা। ছুটল দরজার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

চিৎকার করে উঠল, ডি. কস্টা, 'বস্‌! মাই বস্‌!'

'হায়! হায়! হায়! হায়!'

ডি. কস্টা উন্মাদের মত মাথা নাড়তে নাড়তে প্রলাপ বকতে শুরু করল। গগল্‌স্‌টা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখল সে।

বন্ধ দরজার ওদিক থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। চেয়ার উল্টে পড়ছে, কাঁচ ভাঙার শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎ শোনা গেল খসখসে একটা কণ্ঠস্বর। উলন কথা বলছে, 'এই গগল্‌সের জন্য ছয় ঘণ্টা আগে একজন লোককে খুন করেছি আমি! এখন তোকে খুন করব!'

এরপর আবার হুটোপুটির শব্দ হতে লাগল।

তারপর হঠাৎ, ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া গেল। হলরুমের দরজা খোলার এবং বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল।

পাশের কামরায় কেউ নেই এখন, বুঝতে পারল ওরা। মৃদু শব্দ ভেসে আসছে শুধু রেডিওটা থেকে।

'জিঞ্জির খানের চেহারার বর্ণনা এই রকমঃ প্রকাণ্ডদেহী সে। চুল কালো, চোখ দুটো কালো। মুখে তিনটে ক্ষত চিহ্ন আছে। ভয়ঙ্কর লোক সে। ডান পাটা সামান্য খোঁড়া, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আছে···।'

পাঁচ

মাহবুব উল্লাহ শিকদারের বাড়ি। বাড়িটা তিনতলা। নিচের তলায় একটি রেস্তোরাঁ। উপর তলাগুলো শিকদার ব্যবহার করে।

ভোর হয়ে গেলেও রেস্তোরাঁটা খোলেনি তখনও। গেট পেরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল উলন।

উঁচু বারান্দায় উঠে উলন দাঁড়াল একটি বড় আকারের দরজার সামনে। দরজার মাথায় নিওন সাইন জ্বলছে—'শিকদার রেস্তোরাঁ'।

দরজার গায়ের বোতামে একটা সাদা আঙুল রেখে চাপ দিল উলন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

'কে···কাকে চাই?'

গরিলার মত দেখতে একটা লোক দরজা খুলে দিয়ে জানতে চাইল।

উলন বলল, 'তুমি হাক্কা?'

'হাক্কা।'

'আমি শিকদারের সঙ্গে দেখা করব।'

হাক্কা ভোরের মৃদু আলোয় উলনকে পরিষ্কার চিনতে পারল না। বলল, 'কে তুমি?'

খেপে গেল উলন। তার ডান হাতটা নাচতে লাগল শূন্যে ফড়িংয়ের মত।

ছিটকে পিছিয়ে গেল হাক্কা। রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে কথা বলে উঠল সে, 'মাফ চাই, হুজুর! ভুল করে ফেলেছি। এবারটির মত মাফ করে দিন!'

উলন নিঃশব্দে প্রবেশ করল রেস্তোরাঁর ভিতর। কাস্টমারদের জন্য রেস্তোরাঁ এখন বন্ধ হলেও ভিতরে বেশ কয়েকজন লোককে দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে চেয়ার দখল করে বসে আছে।

প্রত্যেকটি লোককে একবার করে দেখে নিল উলন। একজন লোক একা একটা টেবিলে বসে সিগারেট টানছে। তার কোলের উপর পড়ে রয়েছে চকচকে একটা রিভলবার।

উলনের পিছন থেকে হাক্কা বলে উঠল, 'ঝ্ সাত নম্বর কেবিনের ভিতর···।'

উলন এগিয়ে গেল সাত নম্বর কেবিনের দিকে।

কেবিনে ঢুকে উলন দেখল মাহবুব উল্লাহ শিকদার বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালছে।

উলনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল শিকদার। অপ্রতিভ দেখাল তাকে। বলল, 'বসো।'

বসল না উলন। বলল, 'শিকদার, একটা কথা তোমাকে আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করছি।'

শিকদার বোকার মত চেয়ে রইল উলনের মুখের দিকে।

উলন জানতে চাইল, 'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করো?'

শিকদার ঢোক গিলল। মদের গ্লাসটা তুলে চুমুক দিয়ে অর্ধেক খালি করে ফেলল সেটা। বলল, 'কী আশ্চর্য! এসব কথা এমন হঠাৎ, সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করার মানে?'

'একটা টেবিল দখল করে অচেনা একজন লোক বসে রয়েছে দেখলাম। তার কোলের ওপর রয়েছে একটা রিভলবার। শিকদার, তুমি কি সন্দেহ করো—আমি তোমার শত্রু?'

উলনের মুখোমুখি দাঁড়াল শিকদার। একটা হাত রাখল উলনের কাঁধে। বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো! ওর নাম আমীর খান। আমার দলের লোক ও। ছিঃ ছিঃ, তুমি এসব কথা ভাববে জানলে···যাক গে, তোমার খবর কি?'

উলন বলল, 'ব্যর্থ হয়েছি।'

শিকদার তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'জানতাম। তুমি তো আমার কথা শুনলে না। কোথাকার পানি কোথায় গড়িয়েছে শুনি।'

বলতে শুরু করল উলন। তার শেষ দিকের কথাগুলো এই রকম, 'কুয়াশাকে চিনলেও, আসলে চিনতাম না। সত্যি কথা বলতে কি, তার ক্ষমতা অসীম। যাই হোক, এক সময় সে তার সহকারীদের পাশের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। খানিকক্ষণ লড়াই হয় আমাদের মধ্যে। সর্বক্ষণই সে আমার ডান হাতের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। বিদ্যুতের মত চোখের পলকে মুভ করার অসাধারণ ক্ষমতা তার। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হই আমি।'

পরপর দু'বার ঢোক গিলল শিকদার। বলল, 'সে তোমাকে অনুসরণ করেনি তো?'

'না।'

সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে মুখে পুরল উলন।

'দুঃখের বিষয় গগল্‌স্‌টা আনতে পারিনি।'

উলন বলল। তার কথা শেষ হতেই ঝন ঝন শব্দে ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠল। স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল শিকদার।

'কি হলো!'

শিকদারের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। কাঁপছে সে।

'বিপদ সঙ্কেত! উপরতলায় গার্ড দিচ্ছে ভোমর আলী। একমাত্র পুলিস হানা দিলেই এই বিপদ সঙ্কেত বাজাবার নির্দেশ আছে তার ওপর···।'

ঝড়ের বেগে কেবিনের ভিতর ঢুকল আমীর খান। রিভলবারের বদলে তার হাতে একটা স্টেনগান দেখা যাচ্ছে এখন।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠল শিকদার, 'এখানে কি? পুলিস হানা দিয়েছে—বুঝতে পারছ না! যাও, যতক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখো, পালাবার সময় দরকার আমাদের।'

ঝড়ের বেগে আবার বেরিয়ে গেল আমীর খান।

শিকদার নিজের মাথার চুল ধরে টানতে টানতে বলল, 'যত কিছুই করি, পুলিসের খাতায় আমার নামে কোন অভিযোগ নেই। এর জন্য তুমি দায়ী, উলন। ইউনুসকে খুন করার জন্যে পুলিস তোমাকে খুঁজছে। এখানে আসার সময় নিশ্চয়ই পুলিসের লোক তোমাকে অনুসরণ করে এসেছে।'

'অসম্ভব! আমাকে কেউ অনুসরণ করেনি!'

শিকদার চিৎকার করে উঠল, 'এই তোমার এক দোষ। নিজের ভুল স্বীকার করতে চাও না।'

উলনকে এতটুকু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে না। সে সহজ ভাবেই বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে বড় জোর বেআইনী অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনতে পারে পুলিস। এক কাজ করো না হয়। আমাকে তুলে দাও পুলিসের হাতে। ওরা আমাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। ঠিক বেরিয়ে আসব আমি।'

শিকদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল উলনের দিকে, 'কি ভাবো তুমি আমাকে, উলন? বেঈমান? তুমি জানো না, আমি সে ধরনের লোক নই? এসো, দেখা যাক কি করা যায়।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে একটা লোক। শিকদার তার দিকে তাকাল, জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, ভোমর?'

'পুলিস! ঘিরে ফেলেছে গোটা বাড়ি!'

শিকদার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমীর খান দরজার গায়ে ছোট্ট একটা খোপের ঢাকনি খুলে গর্তের ভিতর স্টেনগানের নল ঢুকিয়ে দিয়ে গুলিবর্ষণ করছে।

'থামাও!'

গর্জে উঠল শিকদার।

স্টেনগানের গুলিবর্ষণ থামল। এমন সময় বাইরের বারান্দা থেকে একটা ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'পুলিস ইন্সপেক্টর আরিফুর রহমান বলছি। সারেণ্ডার করো সবাই। গুলি করে কোন লাভ নেই। আমরা ঘিরে ফেলেছি চারদিক থেকে। তোমাদের গোপন পথগুলোও বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।'

শিকদার তার দলের লোকদের উদ্দেশে বলল, 'আমীর খান যতক্ষণ পারে ঠেকাবার চেষ্টা করুক। উপরে যাচ্ছি আমরা। দেখি পালাবার কোন উপায় করা যায় কি না। ভোমর, দেখে এসো আণ্ডারগ্রাউণ্ড সুড়ঙ্গ পথে পুলিস আছে কিনা।'

অনুচরদের নির্দেশ দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল শিকদার। তার পিছু নিল উলন এবং হাক্কা।

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে পৌঁছুল ওরা। এমন সময় আমীর খান চিৎকার করে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে ওরা দেখল দরজার গায়ের গর্ত থেকে স্টেনগানের নলটা সরে এসেছে। আমীর খান শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। দরজার গায়ের গর্ত দিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে পড়েছে একটি রিভলবারের নল।

আমীর খানের বাহুতে গুলি লেগেছে। অপর হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছে সে।

'মরতে হবে আজ সবাইকে।'

কথাটা বলেই ছুটল শিকদার করিডর ধরে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।

তিনতলায় উঠে প্রকাণ্ড একটি হলরুমের ভিতর ঢুকল ওরা। শিকদার একটি জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে রাস্তা, আবছা অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তবে একজন য়ুনিফর্ম পরা পুলিস অফিসারকে ঠিকই দেখতে পেল সে। অফিসারের হাতের রিভলবারটাও তার দৃষ্টি এড়াল না।

বাড়ির পিছন দিক এটা। রাস্তার ওপারে, জানালার বিপরীত দিকে, পাঁচতলা উঁচু বিল্ডিং একটা। মধ্যবর্তী ফাঁকটা প্রায় বিশ ফুটের মত। এই দূরত্ব লাফিয়ে অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

জানালার কাছ থেকে সরে এল শিকদার। তীরবেগে হলরুমে প্রবেশ করল ভোমর আলী, 'বস্ সুড়ঙ্গ পথের দরজার বাইরেও পুলিস!'

করিডরে শব্দ হচ্ছে। কে যেন ব্যথায় ককাতে ককাতে হেঁটে আসছে এদিকে। সবাই দরজার দিকে তাকাল।

হাক্কা ঢুকল হলরুমে। তার পিছু পিছু স্টেনগান হাতে নিয়ে আমীর খান।

আমীর খানের বাহুর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে অবিরাম। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা। গায়ের শার্টটা ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে। শার্টটা ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে দিয়েছে হাক্কা।

'চলে এলে কেন!'

হাক্কা উত্তর দিল, 'নিচের দরজা প্রায় ভেঙে ফেলেছে পুলিস।'

উলন শান্তভাবে বলে উঠল, 'আমি জানতাম!'

আমীর খান মুখ বিকৃত করে বলল, 'সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি আমরা। এতগুলো দরজা ভেঙে বা পুড়িয়ে তিনতলায় উঠতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে ওদের। এর মধ্যে পালাতে হবে আমাদেরকে।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল শিকদার, 'পালাতে হবে আমাদেরকে! পালাতে আর হবে না, মরতে হবে সবাইকে! পালাবার কোন উপায় নেই।'

এমন সময় অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ খানিক দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা।

'ওহে, শুনছ! তাকাও, এদিকে তাকাও।'

কে কথা বলছে, কোত্থেকে বলছে প্রথমে তা কেউই বুঝতে পারল না। শিকদার এগিয়ে গেল জানালার দিকে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল সে। অবাক কাণ্ড! পুলিস অফিসারটা তো মাত্র কয়েক মিনিট আগেও বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়েছিল গলিটায়। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে অফিসার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে পথের উপর। এতটুকু নড়ছে না সে।

'এই যে, ওহে, এদিকে তাকাও।'

মুখ তুলে বিপরীত দিকে পাঁচতলা বিল্ডিংটার দিকে তাকাল শিকদার। বিল্ডিংটার তিনতলায় একটি জানালা খোলা দেখা যাচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ডদেহী একজন লোক। লোকটার হাতে একটা মোটা হোস পাইপ।

লোকটার চেহারাটা ভয়ঙ্কর। তার চুল কালো, চোখ দুটোও কালো। মুখে

তিনটে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

শিকদার তাকাতেই লোকটা বলে উঠল, 'কোণঠাসা করে ফেলেছে তোমাদেরকে, তাই না? সাহায্য চাও?'

শিকদার কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল।

লোকটা তার হাতের হোস পাইপটা সজোরে নিক্ষেপ করল। প্রথমবারের চেষ্টায় পাইপটা পৌঁছুল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার সফল হলো সে। শিকদার পাইপটা ধরে ফেলল। পাইপের প্রান্তটা বেঁধে ফেলল সে জানালার রডের সঙ্গে।

বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ের জানালা থেকে লোকটা বলে উঠল, 'ভয় পেলে চলবে না। সাহস করে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে আসতে হবে। দাঁড়াও, তোমাদের ভয়টা দূর করে দিই।'

পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল প্রকাণ্ডদেহী লোকটা। ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে আসছে সে।

অবলীলাক্রমে পৌঁছে গেল সে শিকদারের কাছে। লাফ দিয়ে নামল জানালা থেকে হলরুমের ভিতর। বলল, 'সময় নষ্ট করলে মারা পড়বে। কথা পরে হবে। যদি বাঁচতে চাও, এগিয়ে যাও একজন একজন করে।'

উলন বলে উঠল, 'চিনেছি তোমাকে। তুমি জিঞ্জির খান।'

জিঞ্জির খান হাসল।

শিকদার এগোল সবার আগে। পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল সে। ঝুলতে ঝুলতে এগোল বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ের দিকে।

একে একে সবাই পাইপ ধরে ঝুলতে ঝুলতে দুই বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বটা অতিক্রম করল।

বিপদ দেখা দিল আমীর খানকে নিয়ে।

সে বলল, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জিঞ্জির খান, তুমিও চলে যাও। আমি স্টেনটা নিয়ে এখানেই থাকি। মরবই যখন, দু'চারজনকে মেরে মরব।'

জিঞ্জির খান আমীর খানের ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথা খারাপ কোরো না। আমি থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই।'

'কিন্তু আমি পাইপ ধরে ঝুলতে পারব না—না, অসম্ভব!'

'পাইপ ধরতেই হবে না তোমাকে। তুমি আমার কাঁধের উপর আরাম করে বসে থাকবে। পাইপ ধরে ঝুলব আমি।'

হাঁ হয়ে গেল আমীর খানের মুখ। লোকটা পাগল নাকি! পাইপ ধরে ঝুলতে ঝুলতে একা এগোনোই দুষ্কর—আর একজনকে কাঁধে বসিয়ে যাবার চেষ্টা করা মানে দু'জনেরই মৃত্যু।

'দূর...!'

জিঞ্জির খান কথা না বলে সবল দুটো হাত দিয়ে আমীর খানকে তুলে নিল নিজের কাঁধে।

'খবরদার! নড়বে না একটুও!'

পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল জিঞ্জির খান।

রুদ্ধশ্বাসে জিঞ্জির খানের কাঁধের উপর বসে আছে আমীর খান। চোখ বুজে আছে সে। কাঁপছে তার গোটা দেহ। মৃত্যু অবধারিত, বুঝতে পারছে সে। ভাবছে, লোকটা পাগল, নিজেও মরবে আমাকেও মারবে···।

রুদ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জিঞ্জির খানের দুঃসাহসিক কাণ্ডটা অবিশ্বাসভরা চোখে প্রত্যক্ষ করছে উলন, শিকদার এবং হাক্কা। এই পড়ল! এই পড়ল!—আশঙ্কায় দম বন্ধ করে আছে সবাই।

কিন্তু দ্রুত এবং নিপুণ ভঙ্গিতে জিঞ্জির খান পাইপ ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে আসছে। ভয় পাওয়া তা দূরের কথা, হাসছে সে।

পৌঁছে গেল জিঞ্জির খান। জানালা গলে একটা মাঝারি আকারের কামরায় নামল সে। কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল আমীর খানকে মেঝেতে।

চোখ মেলল আমীর খান এতক্ষণে, 'বেঁচে আছি না মরে গেছি!'

হেসে উঠল জিঞ্জির খান। তারপর দ্রুত কণ্ঠে কলল, 'এই বিল্ডিঙেও পুলিস হানা দেবে। তার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের!'

এক ঘণ্টা পর দেখা গেল শিকদার তার নতুন আস্তানা ইয়ট মাছরাঙায় সদলবলে বসে আছে। কথা বলছে সবাই। কিন্তু শিকদার মদ খাচ্ছে চুপচাপ। বোতল প্রায় শেষ করে ফেলল সে। তাকাল প্রকাণ্ডদেহী জিঞ্জির খানের দিকে। বলল, 'জিঞ্জির খান—তোমার বক্তব্য বলো যদি কিছু থাকে।'

'আমি খুন করেছি, তাই জেলের ভাত খেতে হচ্ছিল—কিন্তু নিজেকে আমি খুনী বলে মনে করি না। যাকে আমি খুন করেছি সে ছিল আমারই দলের লোক। আমার সঙ্গে সে বেঈমানী ক'রে। বেঈমানকে খুন করা অপরাধ বলে মনে করি না আমি।'

উলন বলে উঠল, 'তোমাকে আমি সমর্থন করি।'

শিকদার বলল, 'ঠিক আছে। তুমি কি করেছ না করেছ, জানার দরকার নেই আমার। আমরাও তোমার মত বেপরোয়া লোক। তুমি আমাদেরকে নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ। আমরা তোমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। ইচ্ছা করলে তুমি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারো। আমরা কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি। তুমি যত দিন ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো।'

জিঞ্জির খান বলল, 'পুলিস আমাকে খুঁজছে। নিরাপদ আশ্রয় দরকার আমার কিছু দিনের জন্য···।'

'এই ইয়টের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা আর কোথাও পাবে না তুমি। তুমি এখানেই ইচ্ছা করলে থাকতে পারো।'

জিঞ্জির খান হাসল।

শিকদার বলল, 'একটা ব্যাপারে একটু কৌতূহল আছে আমার। ঠিক আমাদের প্রয়োজনের সময় তুমি কোত্থেকে হাজির হলে বলো তো?'

জিঞ্জির খান মৃদু মৃদু হাসছিল। হাসিটা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'পুলিসের ভয়ে তোমাদের আস্তানার পিছনে খালি বিল্ডিংটায় আত্মগোপন

করেছিলাম। গুলির শব্দ পেয়ে ভাবলাম, পুলিসের দল বুঝি আমাকেই ঘেরাও করেছে। পালাবার জন্য নিচে নামি, একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ফেলি। এর আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি পুলিশ আমাকে নয়, তোমাদেরকে ঘেরাও করেছে। বুঝতে পেরে চুপিসারে আবার উপরে উঠে যাই। উপরে উঠে জানালা দিয়ে তোমাদের অসহায় অবস্থা দেখে দয়া হলো আমার। হাজার হোক, তোমাদের মতই আমিও একজন। আমাদের পেশাও সম্ভবত একই ধরনের। তাই তোমাদের জন্য কিছু একটা করা কর্তব্য বলে মনে করি—বুঝতেই পারছ।'

শিকদার সহাস্যে বলল, 'বুঝেছি। আর বলতে হবে না। আজ থেকে তুমি আমাদের বন্ধু।'

শিকদার এবং উলন ইয়টের একটা সুসজ্জিত কেবিনে বসে কথা বলছে। হাক্কা, আমীর খান এবং ভোমর ঘুমিয়ে পড়েছে। জিঞ্জির খান নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এই নতুন পরিবেশে। বসে নেই সে। ইয়টের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে কেবিনেও ঢুকছে সে। তাকে কাছাকাছি দেখলেই কথা বন্ধ করে চুপ করে থাকছে শিকদার আর উলন। তা সত্ত্বেও, দু'একটা শব্দ জিঞ্জির খানের কানে ঢুকছে। 'কুয়াশা' 'ব্ল্যাক গগল্স্'—এই দুটো শব্দ সে পরিষ্কার শুনতে পেল। খানিক পর বুঝতে পারল কুয়াশা এবং কুয়াশার বন্ধু-বান্ধবদেরকে খতম করার পরিকল্পনা করছে শিকদার আর উলন।

আলোচনা শেষ হলো কয়েক ঘণ্টা পর। ঘুম থেকে ওঠানো হলো অনুচর আর বডিগার্ডদের। সবাই এক সঙ্গে মাছরাঙা থেকে নেমে গেল।

শিকদার বলে গেল, 'জিঞ্জির খান, ইয়ট রইল তোমার হেফাজতে। তুমিই সর্বময় কর্তা, আমরা না ফেরা অবধি।'

জিঞ্জির খান বুক ফুলিয়ে বলল, 'পুলিসের ছায়াও যদি দেখি, সেই ছায়াকেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেব না এখান থেকে।'

'শাব্বাশ!'

চলে গেল ওরা সবাই।

মাত্র মিনিট দশেক অপেক্ষা করল জিঞ্জির খান। শিকদারের দল অদৃশ্য হয়ে গেছে বুঝতে পেরে দ্রুত ইয়ট ত্যাগ করে তীরে নামল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল সে-ও।

ছয়

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বেড়াতে এসে শহীদ, মহুয়া, কামাল এবং লীনা এই হোটেলেই উঠেছে।

স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মহুয়া। পিঠে এলোচুল। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিছানার দিকে।

শহীদ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। চোখ তুলে তাকাল মহুয়া ওয়ালক্লকের দিকে। সাড়ে ছয়টা বাজে। শহীদ বিছানা ছাড়ে পাঁচটায়। দেড় ঘণ্টা লেট আজ। মুচকি হাসল সে। যেন বুঝতে পেরেছে শহীদের আজ দেরি করে ওঠার কারণ।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকাল সে। বিয়ে হয়েছে আজ ওদের বেশ ক'বছর হয়ে গেছে। মাতৃত্বের সাধ মেটেনি তার এতদিন। কিন্তু সে সাধ এবার মিটতে যাচ্ছে। রাতে শুভ সংবাদটা প্রকাশ করেছে সে শহীদের কাছে। দশ হাজার টাকা বাজী ধরেছে ওরা। শহীদ বলেছে, মেয়ে হবে। মহুয়া বলেছে, ছেলে। এই নিয়ে বাজী ধরা হয়েছে। যার কথা ফলবে সে পাবে দশ হাজার টাকা।

'ভাবী! নিজের রূপে নিজেই পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

চমকে ঘাড় ফেরাল মহুয়া। দোরগোড়ায় কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে লীনা।

মহুয়া মিষ্টি হেসে বলল, 'আহা! রূপ আমার আবার দেখলে কোথায়! তোমার তুলনায় তো আমি···।'

লীনা এগিয়ে এসে মহুয়ার একটা হাত ধরল। বলল, 'তোমার মত সুন্দরী তো আর একটাও চোখে পড়ল না। আমাকে কেন যে তুমি সুন্দরী বলো বুঝতে পারি না! কই, আর তো কেউ বলে না।'

হেসে উঠে মহুয়া বলল, 'তাই নাকি! আমি কিন্তু একজনের কথা জানি···।'

লীনা ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। কামালের কথা বলছে মহুয়াদি। তাড়াতাড়ি লীনা একহাত দিয়ে মহুয়ার মুখ চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'ভাবী! দাদা রয়েছে···!'

টেলিফোনের শব্দ ভেসে এল ড্রয়িংরুম থেকে।

'এত সকালে কে আবার ফোন করছে!'

মহুয়া বলল, 'কে আবার! নিশ্চয়ই সিম্পসন সাহেব। এই ভদ্রলোক জ্বালিয়ে মারলেন। দিন নেই রাত নেই, হয় ফোন করবেন নয়তো স্বয়ং উপস্থিত হবেন। উদ্দেশ্যও সেই একটাই—'শহীদ, মাই বয়, হেলপ্ মি! কেসটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার শার্প ব্রেনের সাহায্য দরকার।' ব্যস বয়ও অমনি খাওয়া দাওয়া ভুলে কেস-এর মীমাংসা করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল!'

লীনা বলল, 'কিন্তু ভেবে দেখো ভাবী, দাদার কত দাম। কই, সিম্পসন সাহেব তো আর কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যান না।'

'কিন্তু বিপদের কথাটা ভেবে দেখেছ? একের পর এক এই সব খুন-খারাবির কেস নিয়ে কাজ করার ঝুঁকি কতটুকু তা জানো?'

লীনা বলল, 'ঝুঁকি তো থাকবেই। পুরুষ মানুষ···।'

মহুয়া কৃত্রিম রাগে চোখ পাকাল, 'ঠিক আছে! বিয়েটা হয়ে যাক—তখন দেখব স্বামীদেবতাকে রাত দুপুরে খুনীর পিছনে ছুটতে দিতে আপত্তি করো কিনা?'

'ভাবী, আবার···।'

কামালের সঙ্গে লীনার মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা বেশ পুরানো। মাত্র কয়েকদিন আগে ওরা শহীদের আব্বা, মহুয়া এবং শহীদকে ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে বিয়ের অনুমতি চেয়েছে। বলা-বাহুল্য, সবাই সানন্দে অনুমতি

দিয়েছে। তারিখ ঠিক হয়নি এখনও। তবে মাস দু'য়েকের মধ্যেই শুভকর্ম সেরে ফেলা হবে।

করিডরে পদশব্দ শোনা গেল। কেউ যেন দৌড়ে আসছে। মহুয়া এবং লীনা চিনতে পারল পায়ের শব্দটা। কামাল আসছে। লীনা পা বাড়াল অপর দরজার দিকে।

মহুয়া বলে উঠল, 'পালাচ্ছ কেন? ক'দিন পর তো কাছ ছাড়া হতে দেবে না···।'

কামাল কালবৈশাখীর ঝড়ের মত কামরায় ঢুকল। চিৎকার করে কিছু বলার জন্য মুখ হাঁ করে আছে যেন সে। কিন্তু মহুয়া এবং লীনাকে দেখে নিজেকে সামলে নিল।

মহুয়া বলে উঠল, 'অমন হাঁ করে রইলে কেন! কি বলবে বলো! লীনাকে দেখে অমন···।'

কামালের মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। গম্ভীর শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'মহুয়াদি, কামরা থেকে বেরিয়ে যাও তোমরা। এখুনি!'

কামালের গলায় এমন একটা ভীতিপ্রদ সুর ছিল যা শুনে ধ্বক করে উঠল মহুয়ার বুক।

'কি হয়েছে···কোন খারাপ খবর নাকি?'

'বেরোও!'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল কামাল।

শহীদ জেগেই ছিল। মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ও। নামল মেঝেতে। জানতে চাইল, 'কামাল?'

কামালের অস্বাভাবিক আচরণে শহীদও বুঝতে পেরেছে, বিপদের খবর পেয়েছে কামাল।

মহুয়া কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করার পর দরজার দিকে পা বাড়াল। লীনাও তার অনুসরণ করল।

কামাল কথা বলে উঠল, 'ডি. কস্টা এইমাত্র ফোন করেছিল। কুয়াশা বিপদে পড়েছে···।'

'কুয়াশা বিপদে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। আর কিছু বলেনি ডি. কস্টা। এখুনি যেতে বলেছে আমাদেরকে কুয়াশার আস্তানায়···।'

পনেরো মিনিট পরের ঘটনা। কুয়াশার আস্তানা। পাঁচতলার একটি কামরার মাঝখানে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে শহীদ, কামাল, রাসেল। ওদের তিনজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমারী ওমেনা আর ডি. কস্টা।

শহীদের চেহারা পনেরো মিনিটের মধ্যে আমূল বদলে গেছে। ইস্পাতের মত একটা কাঠিন্য তার সারা মুখে। চোখ দুটো বাঘের চোখের মত জ্বলছে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে শহীদ। ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে।

'নিজের পরিচয় দেয়নি লোকটা?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তরে ডি. কস্টা বলল, 'ডিয়েছিল। আইস অভিযানের মেম্বার নাকি সে। নাম ইকবাল আহমেড। সেই একমাত্র অভিযাত্রি, যে বেঁচে গেছে।'

'লোকটার হাত সাদা? গায়ের রঙ লালচে? মাথার চুল সাদা? বয়স ত্রিশ-বত্রিশ? রোগা? ডান হাতটা ওড়ে ফড়িংয়ের মত?'

'রাইট—রাইট!'

'আর কোন বৈশিষ্ট্য!'

ডি. কস্টা বলল, 'চোক ডুটো মুরগীর ডিমের মটো। টাল গাছের মটো টল।'

আচমকা, সম্ভবত বাইরের করিডর থেকে, আর্তনাদ ভেসে এল, 'বাঁচাও! মেরে ফেলল! বাঁচাও! বাঁচাও···।'

অচেনা একটা কণ্ঠস্বর। কিন্তু চিৎকারটার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যে ওদের প্রত্যেকের শরীরে ভয়ের শিহরণ খেলে গেল।

সবাই ছুটল দরজার দিকে। রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে এল শহীদ এবং কামাল, বাকী সবাই ওদের পিছনে। কিন্তু করিডর ফাঁকা, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছুটল ওরা সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির সামনে পৌঁছুবার আগেই একজন সুবেশী লোক সিঁড়ির ধাপ টপকে করিডরে আছড়ে পড়ল। করিডরে উপুড় হয়ে পড়েও থামল না লোকটা। আহত, ভীত কুকুরের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে কামালের পায়ের উপর পড়ল সে।

'আমাকে বাঁচান! মেরে ফেলল···আমাকে বাঁচান!'

দ্রুত লোকটাকে দুই হাত দিয়ে খাড়া করে তুলল কামাল। লোকটা আতঙ্কে কাঁপছে, উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে, 'মেরে ফেলবে! বাঁচান! মেরে ফেলবে।'

লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে করিডর ধরে দরজার দিকে নিয়ে চলল কামাল।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়েছিল সবাই কিন্তু শহীদ একলাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে নিচের দিকে নেমে গেছে।

সবাই দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়।

মিনিট পাঁচেক পরই ফিরল শহীদ। বলল, 'ভদ্রলোকের পিছু পিছু সত্যি কয়েকজন লোক আসছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে। ধাওয়া করেও সুবিধে করতে পারলাম না। নিচে নেমে দেখি গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে ওদের।'

অপ্রত্যাশিতভাবে কুয়াশার ব্যক্তিগত এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেল। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল স্বয়ং কুয়াশা!

'আরে! কোথায় ছিলে তুমি?'

কামাল জানতে চাইল। ফিরে এসেছে সে এইমাত্র করিডরে, আগন্তুক ভদ্রলোককে রিসেপশনে বসিয়ে রেখে।

কুয়াশা বলল, 'সে অনেক কথা। পরে শুনো। তোমরা এখানে জটলা করছ কেন?'

সব কথা বলা হলো কুয়াশাকে।

কুয়াশা জানতে চাইল, 'কই, সে লোক কোথায়?'

কামাল বলল, 'লোকটাকে তোমার রিসেশপন রূমে বসিয়ে রেখে এসেছি আমি। নিরাপদেই আছে সে।'

সবাই পা বাড়াল রিসেশপন রূমের দিকে।

রিসেপশনে ঢুকল সবার আগে কুয়াশা। রূমটা খালি দেখে সে জানতে চাইল, 'কই? কোথায় সে লোক?'

কামালের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'কী আশ্চর্য! এক মিনিট আগে এখানে বসিয়ে রেখে গেছি আমি···।'

পাশের কামরার দরজার দিকে পা বাড়াল সে। পাশের কামরাটা কুয়াশার লাইব্রেরী। প্রকাণ্ড হলরূমের মত আকার। বইয়ের পাহাড় গড়ে উঠেছে রূমের সর্বত্র। মেঝে থেকে সিলিং অবধি শুধু বই, বই আর বই। এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কামাল। তার পিছনে কুয়াশা এবং শহীদ।

কামাল থমকে দাঁড়াল। সুবেশী লোকটা ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা কাঁচের শোকেসের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে সে।

কামালকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দ পায়ে লোকটার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'কিছু দেখছেন বুঝি?' চমকে উঠে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত বেগে ঘুরে দাঁড়াবার ফলে মাথার চুল নেমে এসেছে কপালে। চোখের গগল্‌স্‌টা কালো চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ঝট্ করে গগল্‌স্‌টা চোখ থেকে নামিয়ে শোকেসের উপর রেখে দিল সে।

লোকটার শরীরের গঠন বেশ মজবুত। অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে তার উপর দিয়ে, গায়ের তামাটে রঙ দেখলেই বোঝা যায়।

'গগল্‌স্‌টার প্রতি আগ্রহ আছে আপনার, মনে হচ্ছে?'

লোকটা বলে উঠল, 'হ্যাঁ—না!'

কুয়াশা বলল, 'নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন গগল্‌স্‌টা সাধারণ কোন গগল্‌সের মত নয়। লেন্‌স্‌গুলো দু'ইঞ্চি মোটা, তার উপর কালো। এমন কালো যে কোন ধরনের আলোই, তা যতই শক্তিশালী হোক, ওটার ভিতর দিয়ে যেতে পারে না।'

'কিন্তু এ জিনিসের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। আসলে হয়েছে কি জানেন, আমার গগল্‌স্‌টা পড়ে গেছে কোথায় যেন। এটাকে দেখে চোখে পরেছিলাম। আমি আবার চোখে কম দেখি।'

নিজেকে সামলে নিয়েছে লোকটা ইতিমধ্যে।

কুয়াশা বলল, 'লেন্‌স্‌গুলো যে পদার্থের ভিতর আটকানো, সে পদার্থটা চিনতে পারেন? প্লাস্টিক বা হাতির দাঁত নয়···।'

লোকটা অপ্রতিভ হাসল, 'না, চিনতে পারছি না। আমি আসলে ভুলক্রমে ওটা চোখে লাগিয়েছিলাম···।'

'পদার্থটা মনে হয় মাছের চামড়া বা ওই জাতীয় কিছু। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, আর্কটিক সাগরের গভীর জলে এক ধরনের মাছ পাওয়া যায়, এ পদার্থটা সেই মাছেরই স্কিন।'

লোকটা কামালের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'গুণ্ডা লোকগুলো এখনও

আছে?'

কামাল বলল, 'না। তারা পালিয়ে গেছে।'

কুয়াশার দিকে তাকাল লোকটা, 'আমি জানি না আপনাদের মধ্যে মি. কুয়াশা কে। আমি দেখা করতে এসেছি…।'

কুয়াশা বলল, 'আমিই কুয়াশা। কিন্তু, একদল লোক আপনার পিছু ধাওয়া করেছিল কেন বলুন তো?'

'ওরা আমাকে খুন করতে চাইছিল। না…ঠিক যে খুন করতে চাইছিল তাও মনে হয় না। তা যদি চাইত পিছন থেকে গুলি করলেই তো পারত। ওদের একজনের হাতে আমি রিভলভার দেখেছিলাম। আমার মনে হয়, ওরা আমাকে কিডন্যাপ করার জন্য পিছু ধাওয়া করছিল।'

'কারণ?'

লোকটা বলল, 'তা বলতে পারব না। অনেক ভেবেও আমি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বড়লোকও নই বা আমার মূল্যও এমন বেশি কিছু নয় যে কেউ আমাকে কিডন্যাপ করে…'

কুয়াশা বলল, 'আসুন। ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলি আমরা।'

ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। লোকটা পিছন থেকে কথা বলে উঠল।

'গগল্‌স্‌টা শোকেসের ভিতর তালাবন্ধ করে রাখলে ভাল হত না?'

কুয়াশা পিছন ফিরে না তাকিয়েই বলল, 'কি দরকার। ওখানেই থাক। ওটা এমন কিছু মূল্যবান জিনিস নয়।'

ড্রয়িং রুমে এসে বসল ওরা সবাই।

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বলল, 'আমার নাম ইকবাল আহমেদ।'

ডি. কস্টা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ইম্‌পসিবল!'

লোকটা বলল, 'ইম্‌পসিবল? হোয়াই!'

রাজকুমারী কথা বলে উঠল এবার, 'এর আগে একজন লোক এসেছিল, সে-ও নিজেকে ইকবাল আহমেদ বলে দাবি করে। সে বলে, আইস অভিযানের একমাত্র জীবিত মেম্বার সে…।'

'মিথ্যে কথা! সে যাই হোক, মস্তবড় জালিয়াত সে। ইকবাল আহমেদ আমি স্বয়ং। আইস অভিযানের একমাত্র জীবিত সদস্য আমিই।'

কুয়াশা বলল, 'সে লোকটা যে ইকবাল আহমেদ নয় তা আমি জানি। যাক, আপনি কি নিজের পরিচয় প্রমাণ করার জন্য কাগজপত্র দেখাতে পারেন?'

'পারি। এই যে, দেখুন।'

ইকবাল আহমেদ প্যান্টের পকেটে হাত ভরতে গেলে কুয়াশা বলল, 'থাক, থাক। দেখার দরকার নেই। প্রমাণ আপনার কাছে আছে এটা জানাই যথেষ্ট। ভাল কথা, আপনাদের অভিযান ব্যর্থ হলো কেন, ব্যাখ্যা করে বলুন তো? শুনেছি, অলৌকিক কি একটা ব্যাপার ঘটার ফলেই…।'

ইকবাল চৌধুরী সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কিন্তু সে-কথা আপনি জানলেন কিভাবে!'

কুয়াশা বলল, 'সেই ভুয়া ইকবাল আহমেদ গল্পটা বলে গেছে।'

ইকবাল বলল, 'লোকটা এত সব কথা জানল কিভাবে! আমি তো এর কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, লোকটা ভুয়া হলেও তার গল্প কিন্তু ভুয়া নয়। সত্যিই আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেছে অলৌকিক একটা শক্তির আক্রমণে···।'

জানতে চাইল রাজকুমারী, 'দারুণ ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

ইকবাল বলল, 'বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তাকে অবিশ্বাস করি কিভাবে। জিনিসগুলোকে আমি নিজে দেখেছি।'

'দেখতে কি রকম?'

'বর্ণনা করা অসম্ভব। আকারহীন, প্রাণী বা অদ্ভুত এক মহাশক্তি বলে মনে হয়। এর বেশি বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। যে দেখেনি সে বুঝতে পারবে না জিনিসগুলো ঠিক কি রকম দেখতে। এমন কোন জিনিস নেই, যার সাথে তাদের চেহারার তুলনা দেয়া যায়। তাদের অস্তিত্ব আছে, তারা বাস্তব সত্য বলে মনে হয় না। অথচ সত্যি তাদের অস্তিত্ব আছে, তাদের দেখা যায়। কোত্থেকে যে আসে তাও বোঝার কোন উপায় নেই। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ তাদেরকে দেখা যায়। দু'এক মুহূর্তের জন্য দেখা যায়। তারপরই নেই হয়ে যায়। আপনারা কি ভাবছেন আমি পাগল হয়ে গেছি? বলা যায় না, হয়তো সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। কিন্তু যা ঘটেছে, পরিষ্কার মনে আছে আমার। একমাত্র আমিই সেই মহাশক্তির হাত থেকে বেঁচে গেছি। আমার বন্ধুরা সবাই হারিয়ে গেছে। তাদেরকে নিয়ে গেছে সেই আকারহীন অদ্ভুত মহাশক্তি। জানি না তারা বেঁচে আছে কিনা···'

ইকবাল আহমেদ বিরতি নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'জানেন, আমার বয়স বত্রিশ। কিন্তু চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখছেন? মনে হচ্ছে ষাট বছরের বুড়ো আমি। মাত্র একদিনে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই চেহারা হয়েছে আমার···।'

সবাই অবাক হয়ে শুনছে কথাগুলো। ইকবাল থামতেও কথা বলল না কেউ অনেকক্ষণ। ইকবাল পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে কুয়াশার দিকে বাড়িয়ে দিল। সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা করল কুয়াশা। ইকবাল আহমেদের পরিচয় সংক্রান্ত প্রমাণপত্র।

খানিক পর মুখ তুলল কুয়াশা, 'মি. ইকবাল, যে লোকটা আপনার নাম ধরে এখানে এসেছিল সে কে হতে পারে, ভেবে দেখুন তো?'

'ভেবে দেখব কি! আমি কাউকে আমার পরিচয়ই দিইনি। বুঝতেই পারছি না কে হতে পারে সে। তাছাড়া, আপনার এখানে আসার সময় যারা তাড়া করেছিল তারা কারা, কি তাদের উদ্দেশ্য—কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!'

'তারা সম্ভবত চাইছিল আপনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে না পারেন।'

'কিন্তু তাতে লাভ কি তাদের?'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন?'

'অভিযানে আমার বন্ধুরা হারিয়ে গেছে। আমার সন্দেহ কেউ বেঁচে নেই ওরা। কিন্তু তবু আশা ত্যাগ করতে পারছি না। বেঁচে তো থাকতেও পারে। ফিরে

এসেছি একমাত্র আমি, সুতরাং ওদেরকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার কাঁধেই বর্তেছে। ওদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করা পর্যন্ত শান্ত হতে পারব না আমি। তাছাড়া, আর্কটিক সাগরের ভৌতিক রহস্যের একটা কিনারা না করা পর্যন্তও যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। মোট কথা, আবার আমি যেতে চাই সেই বরফের জগতে। এ ব্যাপারে, মি. কুয়াশা, আমি আপনার সাহায্য ভিক্ষা চাই। সেজন্যই অনেক আশা নিয়ে এসেছি আমি। আপনার স্পেসক্রাফট আছে। নর্থ কানাডার ওই অঞ্চলে পৌঁছুতে হলে আপনার স্পেসক্রাফটটা দরকার। বলুন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন…?'

'এটা আমার কর্তব্য, মি. ইকবাল। একদল মানুষ দুর্গম অঞ্চলে হারিয়ে গেছে—তাদেরকে উদ্ধার করা মানবতার কাজ। আমরা সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ…!'

আনন্দে কেঁদে ফেলল ইকবাল চৌধুরী।

কুয়াশা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবরা বেলা একটার সময় নিচের কাফে ওরিয়েন্টালে লাঞ্চ খাব। আপনিও নিমন্ত্রিত। সেই সময় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, কি বলেন?'

ইকবাল বলল, 'কিন্তু জরুরী একটা অ্যাপয়েনমেন্ট আছে ঠিক একটার সময়। এক কাজ করুন, আমি বরং এখানেই আসব, আজ সন্ধ্যার পর…।'

কুয়াশা বলল, 'তবুও, লাঞ্চ খাওয়ার দাওয়াতের কথাটা মনে রাখবেন। যদি সময় পান…কাফের ডান দিকের কর্ণারে বসব আমরা, ঢুকলেই দেখতে পাবেন।'

ইকবাল উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিয়ে গেল চলে গেল সে। ডি. কস্টা বলে উঠল, 'বস্, হামি আপনাকে সাপোর্ট করিটে পারিলাম না। হাপনি জানেন, লাঞ্চ খাবার সময় হামি কাহাকেও ভাগ ডিটে রাজি নই…।'

কুয়াশা বলল, 'লাঞ্চ খাওয়া আমাদের কপালে নেই সম্ভবত, মি. ডি. কস্টা।'

ইয়ট মাছরাঙায় ফিরে এসেছে জিঞ্জির খান। শিকদার এবং উলন ফেরার আগেই ফিরেছে সে।

শিকদার এবং উলন ফিরল আরও কিছুক্ষণ পর। সাথে হাক্কা, আমীর খান, ভোমর ছাড়াও তাদের আরও কয়েকজন অনুচর এল। খুশি খুশি দেখাচ্ছে শিকদারকে। জিঞ্জির খানের পিঠে চাপড় মেরে দরাজ গলায় সে বলে উঠল, 'তোমার পয় আছে, জিঞ্জির খান।'

বোঝা গেল, কাজকর্ম বেশ সন্তোষজনক ভাবে এগোচ্ছে।

আবার আলোচনা করতে বসল শিকদার এবং উলন। এবার আর জিঞ্জির খানকে কাছে দেখে তারা চুপ করে গেল না। জিঞ্জির খানের সামনেই তারা নিজেদের পরিকল্পনার ছক কষতে শুরু করল।

জিঞ্জির খানেরও কৌতূহলের কমতি নেই। তাদের সব কথাই বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল সে।

সাত

দু'ঘণ্টা পর হাক্কা, ভোমর এবং আরও কয়েকজন অনুচরকে দেখা গেল কাফে ওরিয়েন্টালের দরজার কাছে ঘুরঘুর করতে। কাফের বাইরে থেকেই তারা দেখতে পেল কুয়াশা এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা ডান কোণার একটা টেবিলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে।

পাবলিক এলিভেটরে চড়ে হাক্কার নেতৃত্বে গুণ্ডা দলটা উঠে এল কুয়াশার পাঁচ তলার আস্তানায়। ফাঁকা করিডর ধরে এগিয়ে গেল তারা। দাঁড়াল দরজার সামনে। দরজার গায়ে ছোট্ট একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। তাতে লেখা ঃ নিচের কাফে ওরিয়েন্টালে লাঞ্চ করছি আমরা—কুয়াশা।

হাক্কা এবং ভোমর পরস্পরের দিকে তাকাল। হাক্কা পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল। কিন্তু ভোমর দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা।

'একি! হাক্কা, ভাল ঠেকছে না কিন্তু···!'

'চুপ! তোর সব কিছুতেই শুধু ভয়!'

হাক্কা দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে উঁকি মেরে ভিতরটা দেখে নিল। কেউ নেই রিসেপশন রুমে। পা বাড়াল সে। ঢুকে পড়ল ভিতরে। সবাই অনুসরণ করল তাকে।

'সবাই খুঁজতে শুরু করো! জিনিসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে!'

চাপা স্বরে কথাগুলো বলে রুমের মধ্যবর্তী একটা দরজা পেরিয়ে পাশের লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকল হাক্কা। অন্যান্য সবাই ছড়িয়ে পড়ল এ কামরায় সে-কামরায়।

খানিক পরই হাক্কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'পেয়েছি! কিন্তু···।'

লাইব্রেরী রুমে ঢুকল সবাই।

হাক্কা দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঁচের শোকেসের সামনে। গগল্‌স্‌টা দেখতে পেয়েছে সে।

'দাঁড়িয়ে আছ যে! তুলে নাও। চলো, পালাই তাড়াতাড়ি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ভোমরের দিকে তাকাল হাক্কা। তার মুখে অদ্ভুত একটা বিমূঢ়তা ফুটে উঠেছে। বোকার মত জিজ্ঞেস করল সে, 'সবাই দেখতে পাচ্ছিস গগল্‌স্‌টাকে?'

'তার মানে?'

হাক্কা উত্তর না দিয়ে গগল্‌স্‌টা ধরতে গেল। কাঁচের সেল্‌ফের উপর রয়েছে গগল্‌স্‌টা।

বিদ্যুৎবেগে হাতটা সরিয়ে নিল হাক্কা। এবার নিয়ে দু'বার ব্যর্থ হলো সে গগল্‌স্‌টা ধরতে। গগল্‌সের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে হাতটা ধরতে গেলেই, কিন্তু স্পর্শবোধ নেই একদম। গগল্‌স্‌টা যেন গগল্‌স্‌ নয়, বাতাস। অথচ দেখা যাচ্ছে জিনিসটাকে। কিন্তু স্পর্শ করা যাচ্ছে না···।

'কি হলো?'

হাক্কা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভোমরকে, 'যাদু জানে কুয়াশা। তখনই বলেছিলাম—আমরা পারব না।'

ভোমর হাত বাড়াল গগল্‌স্‌টা ধরার জন্য। সেও সবেগে ফিরিয়ে নিল হাত। ছুঁতে পারা যাচ্ছে না গগল্‌স্‌টাকে, অথচ রয়েছে সেটা সেই একই জায়গায়। গগল্‌সের ভিতর দিয়ে হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে, যেন বাতাসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে হাতটা, শেষে গিয়ে ঠেকছে সেলফের কাঁচের দেয়ালে। কোন মতেই স্পর্শ করা যাচ্ছে না গগল্‌স্‌টাকে।

বারবার চেষ্টা করল ওরা। সবাই একবার করে পরীক্ষা করল ব্যাপারটা। কিন্তু যা-কে-তাই, কোন লাভ হলো না। ঘেমে উঠল সবাই। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

হাল ছেড়ে দিয়ে হাক্কা বলে উঠল, 'চল্‌ পালাই! এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়। জিনিসটা রয়েছে, অথচ নেই!'

এমন সময় পদশব্দ ভেসে এল।

'তৈরি থাকো সবাই!'

হাক্কার কথা শেষ হওয়ামাত্র সবাই পকেট থেকে লোডেড রিভলবার বের করল। পা বাড়াল সবাই দরজার দিকে।

সবার আগে ছিল হাক্কা এবং ভোমর। কি যে দেখল ওরা কে জানে, লাফিয়ে পিছিয়ে এল দু'জনেই। পিছনের অনুচরদের সঙ্গে ধাক্কা খেলো দু'জনই। তিনজন তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল।

হাক্কা এবং ভোমরের হাতে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও গুলি করল না তারা। ভীষণ আতঙ্কে ছানাবড়া হয়ে গেছে তাদের দু'জোড়া চোখ। জীবনে হাজার রকম বিপদের মুখোমুখি হয়েছে তারা—কিন্তু সামনে যে বিপদ দেখতে পাচ্ছে, তেমন দেখা তো দূরের কথা, শোনেওনি কোন কালে।

লাইব্রেরী রুমের মোট তিনটে দরজা। জানালা চারটে। প্রতিটি দরজা এবং জানালার ঠিক সামনে, মেঝের উপর, পেন্সিলের মত সরু কিন্তু দেড় গজ করে লম্বা গর্ত দেখা যাচ্ছে। গর্তগুলো নতুন নয়। তবে হাক্কা বা তার দলের কেউ আগে এগুলো লক্ষ করেনি।

সিলিংয়ের উপরও, জানালা-দরজাগুলোর ঠিক উপরই তেমনি গর্ত দেখা যাচ্ছে। পেন্সিলের মত সরু এবং দেড় গজ করে লম্বা। সিলিংয়ের উপরকার গর্তগলো থেকে নেমে আসছে নীল রঙের অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখা। নীল রঙের পর্দার মত ঝুলছে প্রতিটি দরজা আর জানালার সামনে সেই অত্যাশ্চর্য অগ্নিশিখা। সেই সঙ্গে তীব্র, একঘেয়ে, হিস হিস শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পালাবার পথ বন্ধ।

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।'

বিকট অট্টহাসির শব্দ শুনে শত্রুদের সবাই চমকে উঠে তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে।

দেখা গেল ডি. কস্টাকে। একটা প্রকাণ্ড বুক সেল্‌ফের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা,শহীদ, কামাল, রাসেল এবং রাজকুমারী ওমেনা। ওদের প্রত্যেকের হাতে অস্বাভাবিক বড় আকারের একটা করে রিভলবার।

হাক্কা এবং ভোমর নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়েই রইল। নড়বার শক্তি নেই তাদের। কুয়াশা তার হাতের রিভলবার উঁচিয়ে ধরল। গুলি করল সে। একটা···দুটো···তিনটে···চারটে···

হাক্কা ছাড়া বাকী সবাই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

শান্ত গলায় কুয়াশা বলল, 'ওদেরকে রেখে বাকী লোকটাকে আমার সামনে নিয়ে এসো। কামাল এবং রাসেল যাও।'

হাক্কাকে গিয়ে ধরল ওরা। টেনে নিয়ে এল তাকে কুয়াশার সামনে। তার রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে পকেটে ভরল রাসেল। ডি. কস্টাকে কিছু বলতে হলো না। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে শত্রুদের বাকী রিভলবারগুলো।

'ওমেনা, কারেন্ট অফ করে দাও।'

রাজকুমারী দেয়ালের সুইচ বোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিতেই জানালা-দরজার সামনে থেকে নীল অগ্নিশিখা অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাক্কা কুয়াশার সামনে, মেঝের উপর বসে আছে।

'কেন এসেছ তোমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাদেরকে?'

হাক্কা কথা বলল না। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে সে। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করার চেষ্টা করছে সে। কথা বলা হবে আত্মহত্যারই সামিল। শিকদার জানতে পারলে কাঁচা চিবিয়ে খাবে তাকে।

কুয়াশা বলল, 'রাসেল, একটা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধো একে। তারপর একটা জানালার সামনে টেনে নিয়ে যাও চেয়ারটা। মি. ডি. কস্টা, হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রিসিটি অন করে দেবেন তারপর।'

হাক্কা চিৎকার করে উঠল, 'না!'

কুয়াশা বলল, 'এখনও ভেবে দেখো কি করবে। যা জিজ্ঞেস করব তোমাকে, সঠিক উত্তর দেবে। তাহলে শাস্তি দেব না। কিন্তু···।'

'কিন্তু আমাকে শিকদার সাহেব মেরে ফেলবে···।'

কুয়াশা বলল, 'শিকদার কেন, শিকদারের ছায়াও তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। সে দায়িত্ব আমার।'

হাক্কা বলল, 'গগল্‌স্‌টা চুরি করে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে আমাদেরকে শিকদার আর উলন···।'

'উলন কে?'

'উলন লোকটা ঠিক মানুষ নয়।'

শহীদ বলে উঠল, 'মানুষ নয় মানে?'

হাক্কা বলল, 'লোকটার গায়ের রঙ লালচে। হাত দুটো সাদা। তার ডান হাতটা···'

কুয়াশা বলে উঠল, 'ফড়িংয়ের মত ওড়ে সব সময়, না?'

'হ্যাঁ।'

'গগল্‌স্‌টা কি কাজে লাগে? কেন তাদের দরকার সেটা?'

'তা জানি না। তবে যতটুকু শুনেছি, গগল্‌স্‌টা দরকার হবে বরফের দেশে পৌঁছুলে। ওরা বরফের দেশে যেতে চায়। কেন, তা জানি না। শিকদার এবং উলন, ওরা আমাদেরকে ওদের সব কথা বলে না।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'উলন কে? কোত্থেকে এসেছে সে?'

'তাও আমি জানি না। হঠাৎ একদিন ওরা দু'জন এসে হাজির হলো। কালো রঙের ভূতের কথা বলে ওরা।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'বরফের দেশে কবে যাবে ওরা? বরফের দেশ—নির্দিষ্ট করে নাম বলো জায়গাটার। ঠিক কোথায় যেতে চায় ওরা?'

'কবে যাবে জানি না। আপনার স্পেসক্রাফটটা দখল করতে চায় ওরা। ওটা ছাড়া নাকি সেখানে যাওয়া কঠিন। জায়গাটার নাম জানি না। ওরা বলেনি। আর্কটিক না কি যেন নাম আছে এক সাগরের, সেদিকেই যাবে বুঝি।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'আজ সকালে যে লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—দ্বিতীয় ইকবাল আহমেদ, কে সে?'

'শিকদার সাহেব নিজে। ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল সে। আপনার কাছে প্রথম আসে উলন। সে ব্যর্থ হয়ে শিকদারকে পাঠায়। ভুল বুঝিয়ে আপনার স্পেসক্রাফটটা অধিকার করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। শিকদার আজ সকালে এখানে আসার সময়, তাকে যারা ধাওয়া করে তারা আমাদেরই লোক। তারা অভিনয় করে ঘটনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টায়...'

সব কথা গড়গড় করে বলে যেতে লাগল হাক্কা।

সবশেষে জানতে চাইল সে, 'কিন্তু জানালা দরজার সামনে নীল আগুন...কি ওটা? আর গগল্‌স্‌টা রয়েছে দেখতে পেয়েও ধরতে পারলাম না কেন?'

কেউ উত্তর দিল না।

আসলে গগল্‌স্‌টা রাখা ছিল অন্যত্র। আয়নার যাদু বলা চলে পদ্ধতিটাকে। গগল্‌স্‌টা অন্যত্র রেখে আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল কুয়াশা। আর হাই-ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট-এর ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। বিদ্যুৎকে ইচ্ছা মত ব্যবহার করার সাধ মেটাতে গিয়ে রাজকুমারী এই ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে।

কুয়াশার মার্সি পিস্তলের বুলেটে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছে হাক্কার সহযোগিরা। বুলেটগুলো সীসা বা কোন ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়। পিস্তলগুলো দেখতে বিরাট হলে হবে কি, নল থেকে বেরোয় সূচের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্শা। সেগুলো শরীরে বিঁধে যায়। বিষ মেশানো থাকে ক্ষুদ্র বর্শাগুলোর মাথায়। এই বিষ রক্তের সংস্পর্শে আসা মাত্র আক্রান্ত ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে।

জ্ঞান ফিরে এসেছে এতক্ষণে সকলের। মেঝের উপর উঠে বসল সবাই।

শহীদ জানতে চাইল, 'কুয়াশা, এইসব গাধা-গরুগুলোকে নিয়ে কি করবে

এখন?'

কুয়াশা বলল, 'পাঠিয়ে দেয়া যাক আমার দিনাজপুরের আস্তানায়।'

শহীদ জানে এ কথার অর্থ। দিনাজপুরে কুয়াশার একটা আস্তানা গড়ে উঠেছে কিছুদিন আগে। সেখানে অপরাধীদের পাঠায় কুয়াশা। পৃথিবী বিখ্যাত ডাক্তার এবং কেমিষ্টরা সেখানে কাজ করছেন। অপরাধীদের ব্রেন অপারেশন এবং ব্রেন ওয়াশ করা হয় সেখানে। অপরাধীরা তাদের অতীত জীবনের কথা বেমালুম ভুলে যায় অপারেশন এবং ওয়াশের পর। তারা সৎ, সুন্দর এবং নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কুয়াশা তাদেরকে দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করে। দু'বছর পর কুয়াশার আস্তানা থেকে বেরোয় তারা, কুয়াশাই তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। কেউ হয় টিভি মেকানিক, কেউ লেদ-মেশিন অপারেটর, কেউ হয় ড্রাইভার, কেউ হয় ইলেকট্রিশিয়ান। সমাজের সৎ, সুখী আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই দিন কাটতে থাকে তাদের।

হঠাৎ কামাল বলে উঠল, 'পালাচ্ছে!'

শহীদ পা বাড়াল, কিন্তু কুয়াশা ধরে ফেলল ওর একটা হাত। অবাক বিস্ময়ে কুয়াশার মুখের দিকে তাকাল শহীদ।

'পালাতে দাও।'

ফিসফিস করে বলল কুয়াশা।

হাক্কা সুযোগের সন্ধানেই ছিল। কুয়াশা এবং বাকী সবাইকে এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক দেখেই সুযোগটা নিয়েছে। তার দেখা দেখি বাকী শত্রুরাও হাক্কার পিছু পিছু ছুটতে শুরু করেছে।

দরজা পেরিয়ে পাশের রুমে, সেখান থেকে করিডরে বেরিয়ে তীরবেগে ছুটল তারা সিঁড়ির দিকে।

কেউ ওদেরকে বাধা দিল না।

শত্রুরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ডি. কস্টা কোমরে দুই হাত রেখে কুয়াশার সামনে দাঁড়াল।

শহীদ বলল, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা?'

ডি. কস্টা দাবি জানাল, 'ইয়েস! এক্সপ্লেন দ্যাট!'

কুয়াশা বলল, 'সবকথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সবকথা বলার সময় ঠিক এই মুহূর্তে নেই।'

সবাই তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে। রহস্যময় নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভিতর। কারও মুখে কোন কথা নেই। কুয়াশা যতটুকু বলতে চায় ততটুকু বলেছে। এর বেশি তার কাছ থেকে আদায় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আট

কুয়াশার আস্তানার কাছ থেকে সামান্য দূরে রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিল উলন এবং শিকদার।

হাক্কা এবং অন্যান্য অনুচররা ঘর্মাক্ত কলেবরে গাড়িতে এসে উঠল। উত্তেজিত, আতঙ্কিত গলায় ব্যাখ্যা করল তারা নিজেদের ব্যর্থতা।

গর্জে উঠল শিকদার, 'তোরা এক একজন এক একটা অপদার্থ! এই একটু আগে দেখে এসেছি আমি কুয়াশা তার দলবল নিয়ে লাঞ্চ খাচ্ছে…।'

হাক্কা বলল, 'আমরাও দেখেছি। কিন্তু যারা লাঞ্চ খাচ্ছে তারা কুয়াশা এবং তার দলবলের মত দেখতে হলেও তারা আসলে অন্য লোক সবাই। কুয়াশা কিছু লোককে ডামি বানিয়ে হোটেলে বসিয়ে রেখেছে…।'

'বলো কি! ভারী বুদ্ধিমান লোক দেখছি এই কুয়াশা। দেখা যাচ্ছে, লোকটাকে আমি এখনও ভাল করে চিনতে পারিনি!'

কথাগুলো বলল উলন।

শিকদার বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'উলন, তুমি কিন্তু মোটেই সিরিয়াস নও। বারবার ব্যর্থ হচ্ছি আমরা। এভাবে কি করে কাজ হবে?'

উলন বলল, 'ঠিকই বলেছ। এভাবে এগোলে কাজ হবে না। চলো, আমাদের আস্তানায় ফিরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করি। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কুয়াশাকে খতম না করে আমরা অভিযানে বেরুতে পারব না।'

দলবল নিয়ে মাছরাঙায় ফিরে এল শিকদার। তার গম্ভীর চেহারা দেখে জিঞ্জির খান বুঝতে পারল, অবস্থা সুবিধের নয়। কেবিনের দূর-প্রান্তের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

উলনের দিকে তাকিয়ে শিকদার বলল, 'কুয়াশাকে খুন করার কথা ভাবো, বুঝলে! ওই শয়তানকে শেষ না করতে পারলে কোন কাজই এগোবে না।'

উলন বলল, 'একটা বুদ্ধি বের করেছি আমি। শোনো।'

ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল উলন। মাঝে মাঝে উলনকে প্রশ্ন করল শিকদার। তাও নিচু গলায়। যাতে কেউ শুনতে না পায় তাদের গোপন পরামর্শ।

জিঞ্জির খান দূরে বসে আছে। চেয়ে আছে সে উলন এবং শিকদারের দিকে। না, তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু শুনতে না পেলেও জিঞ্জির খান ওদের সব কথা বুঝতে পারছে। চেয়ে আছে সে শিকদার এবং উলনের ঠোঁট দু'জোড়ার দিকে।

জিঞ্জির খান একজন পারদর্শী লিপ-রিডার। মানুষের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই সে বলে দিতে পারে কি বলা হচ্ছে।

তিন ঘণ্টা পরের ঘটনা। কুয়াশার আস্তানা।

শহীদ বসে আছে কুয়াশার পাশে। কুয়াশা আর্কটিক অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর মেরুর একটা ম্যাপ দেখছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। টেবিলের উপর কাগজ আর পেন্সিল রয়েছে। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট মানচিত্র আঁকছে সে কাগজে। টেবিলের উপর বেশ ক'মাস আগের খবরের কাগজ স্তূপীকৃত, সেগুলোও মেলে ধরে দেখে নিচ্ছে দরকার হলেই।

কাজ শেষ করে মুখ তুলে তাকাল কুয়াশা।

শহীদ জানতে চাইল, 'গত কয়েক ঘণ্টা তোমার কোন খবরই পাইনি। ছিলে কোথায়?'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'বুঝলে, শহীদ, আমরা বোধহয় আবার অভিযানে বেরুব। এখনও ঠিক বলতে পারছি না। অভিযানে যেতে ভালই লাগবে, কি বলো? উত্তর মেরুর দিকে এর আগে গেলেও, এতটা গভীরে যাইনি। নতুন ধরনের একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, সন্দেহ নেই। কি যেন জানতে চাইছিলে? হ্যাঁ, উলন এবং ইকবাল চৌধুরী সম্পর্কে। আইস অভিযান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিলাম গত কয়েক ঘণ্টা। রাজকুমারী এবং মি. ডি. কস্টাকে পাঠিয়েছি আমার অন্যান্য আস্তানায়। ওরা অভিযানের জন্য মোটামুটি তৈরি হয়েই আছে। কখন যে রওনা হতে হবে, ঠিক নেই। তোমরাও যাচ্ছ।'

শহীদ জানতে চাইল, 'কালো গগল্‌স্‌টা সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'না। লেন্‌স্‌গুলো অসাধারণ। স্ফটিক মণি জাতীয় পদার্থ দিয়ে জিনিসটা তৈরি বলে মনে হয়। স্ফটিক কিনা তাও বুঝতে পারছি না। স্ফটিক জাতীয় হলেও প্রাকৃতিক নয়, কৃত্রিম।'

কামাল ওদের মুখোমুখি বসে শুনছিল। সে বলে উঠল, 'আমরা অন্তত এটুকু জানি যে শত্রুরা তোমার স্পেসক্রাফট দখল করতে চায়।'

কামালের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন শব্দে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। কুয়াশা টেবিলের পায়ার সঙ্গে ফিট করা সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপে দিল।

কামরার দেয়ালের টিভি পর্দাটা সজীব হয়ে উঠল। করিডরের ছবি ফুটে উঠল পর্দায়। দেখা গেল এলিভেটর থেকে নামছেন সি.আই. ডি ডিপার্টমেন্টের প্রখ্যাত অফিসার মি. সিম্পসন।

দরজা খুলে দিল কামাল।

সহাস্যে মি. সিম্পসন রিসেপশন রুমে প্রবেশ করলেন। বললেন, 'হ্যালো, শহীদ, মাই বয়। হ্যালো, কুয়াশা।'

কুয়াশা মুচকি হেসে মুখোমুখি সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। তা কি মনে করে কুখ্যাত কুয়াশার আস্তানায় আপনার পদধূলি পড়ল আজ, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'দেখো, কুয়াশা, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের তেমন কোন অভিযোগ আর নেই।'

কুয়াশা হাসল, 'তাই নাকি? আমি কি তবে ভাল মানুষ হয়ে গেছি? তা ভাল মানুষের কাছে কি উদ্দেশ্যে আগমন? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি মুভ করেন না?'

মি. সিম্পসন একটু যেন গম্ভীর হলেন। বললেন, 'কর্তব্যের তাগিদে দৌড়োদৌড়ি করতেই হয়, কুয়াশা। শিকদার মাহবুব উল্লাহর নাম জানো তো? তার দলের একজন লোক, লোকটার নাম ইউনুস মিয়া, খুন হয়েছে। আমি জানি, এ খবরও তোমার কাছে অজ্ঞাত নয়। ইউনুসের খুনী কে তা আমরা জানি। লোকটার চেহারা সাধারণ মানুষের মত নয়। কিন্তু তার পরিচয় জানি না আমরা। খবর পেয়েছি, সেই খুনী তোমার এই আস্তানায় এসেছিল। সত্যি কিনা বলো?'

কুয়াশা বলল, 'এসেছিল। গত ভোর রাতে।'

'কেন এসেছিল সে?'

কুয়াশা বলল, 'মি. সিম্পসন, ইউনুসের হত্যাকারীর উদ্দেশ্য, গুণ্ডাসর্দার শিকদার মাহবুব উল্লাহর তৎপরতা—উপর থেকে দেখে এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই করা সম্ভব নয়। এসবের পিছনে গভীর, কল্পনাতীত রহস্য আছে। রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করছি আমি। যদি সফল হই, সব আপনাকে জানাব। এই মুহূর্তে আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কুয়াশার উত্তরে মি. সিম্পসন যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তা তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা গেল। বললেন, 'একজন খুনী তোমার কাছে এসেছিল। তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি শুধু এইটুকুই? জানতে চাই আমি বিশেষ কারণে। তুমি যদি উত্তর না দাও তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক।'

কুয়াশা বলল, 'আপাতত আপনাকে দুঃখ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই, মি. সিম্পসন। যা বলেছি তার বেশি বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন মি. সিম্পসন। কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'বেশ। তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি নও, বুঝতে পারছি। চলি। আবার দেখা হবে।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'তোমার ফোনটা কি ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

মি. সিম্পসন এগিয়ে এসে ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। অফিসের কোন অধঃস্তন অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। একটা গুণ্ডাদলের আস্তানায় হানা দেবার কথা ছিল, তার ফলাফল জানতে চাইলেন। কথা শেষ করে রিসিভারটা ক্রাডলে রাখবার সময় হাত ফসকে সেটা পড়ে গেল টেবিলের উপর। 'সরি,' বলে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিলেন তিনি। তারপর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

দৃঢ় পায়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন মি. সিম্পসন রিসেপশনরুম থেকে।

কুয়াশা বলে উঠল, 'শহীদ, আমার প্রাইভেট এলিভেটরে চড়ে তুমি নিচে নেমে যাও। মি. সিম্পসনকে অনুসরণ করবে তুমি।'

'মি. সিম্পসনকে অনুসরণ করব!'

শহীদ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

কুয়াশা ব্যাখ্যা করল না। বলল, 'হ্যাঁ।'

কালবিলম্ব না করে দ্রুত বেরিয়ে গেল শহীদ রিসেপশন রুম থেকে।

শহীদ রাস্তায় নেমে মি. সিম্পসনকে একটা জীপে চড়ে বসতে দেখল। অপেক্ষারত একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল ও। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সামনের জীপকে অনুসরণ করে যেতে।

শহরের মধ্যস্থলে একটা রেস্তোরাঁর সামনে থামল জীপটা। মি. সিম্পসন জীপ থেকে নেমে রেস্তোরাঁর ভিতর ঢুকলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে শহীদও রেস্তোরাঁর ভিতর ঢুকল।

রেস্তোরাঁটা আধুনিক। ভিতরে ঢুকে শহীদ দেখল মি. সিম্পসন দ্রুত পায়ে একটা ফোন বুদের ভিতর ঢুকছেন। পা বাড়াল শহীদ। ফোন বুদটা দুইভাগে ভাগ করা, মাঝখানে হার্ডবোর্ডের দেয়াল। উপরে তারের জাল। মি. সিম্পসন কার সঙ্গে কথা বলবেন, কি বলবেন শুনতে চায় শহীদ। বুথের অপর অংশে প্রবেশ করে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল সে।

মি. সিম্পসন ডায়াল করছেন, বুঝতে পারল ও। হঠাৎ ওর মাথার পিছনে শীতল ধাতব পদার্থের স্পর্শ অনুভব করল ও। পকেটে হাত দিতে গিয়ে বাধা পেল, পিছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে শিকদার মাহবুব উল্লাহ বলে উঠল, 'আমি শিকদার—সাবধান! নড়েছ কি, মরেছ।'

শহীদ স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

'মি. সিম্পসন যে আসলে মি. সিম্পসন নয় তা ধরে ফেলেছ দেখছি! বাহ্! চমৎকার মেধা তোমাদের। কিন্তু ওই পর্যন্তই! তোমাদের মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দিচ্ছি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দাঁড়াও!'

শহীদ বলল, 'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ পুলিস অফিসারের ছদ্মবেশে আমাদের দলের লোকটা কুয়াশার টেলিফোনের মাউথপীসে এমন একধরনের সাংঘাতিক পয়জন ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে, যে পয়জন মানুষের নিঃশ্বাসের সংস্পর্শে এলেই গ্যাসে রূপান্তরিত হবে, সেই গ্যাস নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করা মাত্র মৃত্যু অবধারিত...।'

বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পেরে শহীদের মুখ ঘেমে উঠল। পাশের বুদে শিকদারের লোক ডায়াল করে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তার গলা শোনা যাচ্ছে, 'কুয়াশা? কুয়াশা বলছ? আমি মি. সিম্পসন...একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি বলে ফোন করছি...শুনতে পাচ্ছি না আমি তোমার কথা...মুখটা আরও এগিয়ে আনো মাউথপীসের কাছে...আমি জানতে চাই, ইকবাল চৌধুরী নামে কোন লোক...।'

শহীদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। মাত্র একটা উপায়ই আছে কুয়াশাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার। সেই উপায়টাই কার্যকরী করার চেষ্টা করল ও। চিৎকার করে উঠলে কুয়াশা হয়তো সাবধান হয়ে যাবে।

চিৎকার করার জন্য হাঁ করল শহীদ। কিন্তু ওর গলা থেকে কোন শব্দ বের হলো না। শিকদার তার হাতের রিভলবারের ব্যারেল দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড এক ঘা মারল।

মাথাটা ঘুরে উঠল শহীদের। রক্তের স্রোত নেমে এল মাথার ক্ষতস্থান থেকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল শহীদ। সময় থাকতে দেহটা ধরে ফেলল শিকদার। পাঁজাকোলা করে দেহটা তুলে নিল। বেরিয়ে এল সে বুদের বাইরে। চিৎকার করে উঠল, 'হেল্প্! হেল্প্! আমার বন্ধু পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।'

দ্রুত চারপাশ থেকে এগিয়ে এল কয়েকজন লোক। কেউ জানল না, এরা সবাই শিকদারের পোষমানা কুকুরের দল। রেস্তোরাঁর ম্যানেজারও ছুটে এল। শিকদারকে সে ভাল করেই চেনে। বন্ধু বলে দাবি করলেও জ্ঞানহীন আহত লোকটা যে তার বন্ধু নয় তা সন্দেহ করলেও শিকদারকে জেরা করার বা বাধা

দেবার সাহস তার নেই। এই ধরনের খুনী লোকদের সঙ্গে লাগতে গেলে খুন হয়ে যেতে হবে—ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে।

শিকদার শহীদের অজ্ঞান দেহটা নিয়ে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁর বাইরে। কেউ তাকে বাধা দিল না বা কোন প্রশ্ন করল না।

গাড়িতে এসে উঠল সবাই। গাড়ি ছুটে চলল দ্রুতবেগে।

এদিকে শিকদারের ডান হাত ভোমর মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশে কথা বলছে তখন কুয়াশার সঙ্গে।

কুয়াশা বলছিল, 'মি. সিম্পসন, আপনি বড় বেশি বিরক্ত করছেন আমাকে। আগেই তো বলেছি, যতটুকু আপনাকে জানাবার জানিয়েছি···।'

হঠাৎ কুয়াশার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। ভোমর শুনতে পেল অপরপ্রান্তের রিসিভারটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। পরমুহূর্তে শোনা গেল কামালের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'কুয়াশা! কি হলো তোমার, কুয়াশা! পড়ে গেলে কেন···কুয়াশা! হায় খোদা!'

সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল ভোমরের মুখে। রিসিভার রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল সে বুদ থেকে।

দেখা গেল দূরের একটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল উলন। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে ভোমরের দিকে।

নয়

মাছরাঙায় ফিরে এল শিকদার আর তার দলবল। জিঞ্জির খান নেই তখন ইয়টে। অবশ্য কয়েক মিনিট পরই ফিরল সে। শিকদার জানতে চাইল, 'কিহে, যাওয়া হয়েছিল কোথায়?'

জিঞ্জির খান একগাল হেসে বলল, 'সারাদিন চুপচাপ বসে থাকতে কার ভাল লাগে? এই একটু বাতাস খেতে বেরিয়েছিলাম।'

শিকদার মেঝেতে শোয়ানো শহীদের জ্ঞানহীন দেহটা দেখিয়ে বলল, 'তোমার কেবিনে নিয়ে যাও ব্যাটাকে। চেষ্টা করে দেখো জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারো কিনা।'

হিংস্র হয়ে উঠল জিঞ্জির খানের চেহারা। বলল, 'জ্ঞান ফিরিয়ে এনে কি লাভ। তুমি অনুমতি দিলে কেটে টুকরো টুকরো করে পানিতে ভাসিয়ে দিই···।'

'না। ওর কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে হবে।'

জিঞ্জির খান হাসল, 'তাই বলো। ঠিক আছে, টরচারের দায়িত্বটা আমাকে দিয়ো।'

শহীদের দেহটা অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

খানিক পরই এল ভোমর এবং উলন। কথা বলে উঠল উলন, 'সাক্সেস্ফুল। কুয়াশা খতম!'

শিকদারের হিংস্র মুখটা কদাকার হয়ে উঠল। গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে।

তার কুৎসিত অট্টহাসি থামল একসময়। বলল, 'প্রথম বাধা দূর হয়েছে। এখন মৃত শয়তানটার স্পেসক্রাফটটা চাই আমার। আর চাই গগল্‌স্‌টা। ওই দুটো পেলেই আমরা রওনা হতে পারি উত্তর মেরুর দিকে—কি বলো?'

ফোনের বেল বেজে উঠল কর্কশ শব্দে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার ধরল শিকদার। বলল, 'হ্যালো? ও, আমীর খান। কি! কি বললে? কুয়াশাকে এইমাত্র দেখেছ? অসম্ভব! বলো কি···তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!···অ্যাঁ। তাকে অনুসরণ করে এইমাত্র টেলিগ্রাম অফিসে পৌঁছেচ তুমি! কিন্তু···এসব কি বলছ তুমি···হায়! হায়!···টেলিগ্রাম অফিসে কি করছে সে?···রেডিওগ্রাম পাঠাচ্ছে? কোথায়?···তুমি একটা কুকুরের বাচ্চা। শোনো, ওকে চোখে চোখে রাখো···আর যদি বাঁচতে চাও তো কোথায়, কার কাছে রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছে সে, রেডিওগ্রামের বক্তব্য কি সব জেনে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো আস্তানায়।'

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রেখে শিকদার গর্জে উঠল, 'উলন! তোমার পয়জন ব্যর্থ হয়েছে!'

'অসম্ভব! তা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ভোমরের দোষ···।'

ভোমর প্রতিবাদ জানাল, 'অসম্ভব! কোথাও ভুল করিনি আমি। মাউথপীসে পাউডারটুকু ঠিকই ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি···।'

উলন বলল, 'যাই হোক, কোথাও কোন ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে। মোটকথা, দোষ আমার পয়জনের নয়!'

দাঁতে দাঁত চেপে শিকদার বলল, 'এখন উপায়?'

উলন বলল, 'আমার কাছে আরও একধরনের মারাত্মক বিষ আছে। এটার নাম হতে পারে, তোমাদের ভাষায়, হিট পয়জন। আমি এবার সেটা ব্যবহার করব।'

'দেখো, উলন, বারবার ব্যর্থ হতে চাই না আমি। যে বিষই তুমি এবার ব্যবহার করো···ব্যর্থতার মুখ যেন আর দেখতে না হয়।'

কথাগুলো বলে শিকদার তার কোটের হাতার কাছে গোপন পকেট থেকে একটা টাইমপীস বের করল। টাইমপীসটা অস্বাভাবিক বড় আকারের, সিল্‌ভারের তৈরি মান্দাতা আমলের জিনিস বলে মনে হয়। শিকদার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টাইমপীসটার দিকে—যেন এই প্রথম দেখছে ওটা সে।

'ক'টা বাজে?'

জিঞ্জির খানের গলা শুনে চমকে উঠে টাইমপীসটা তাড়াতাড়ি গোপন পকেটে লুকিয়ে ফেলল শিকদার। চড়া গলায় বলল, 'সাড়া না দিয়ে কেবিনে ঢোকা খুব খারাপ কথা, জিঞ্জির খান। আমি এসব পছন্দ করি না। যে টাইমপীসটা দেখেছ সেটা সময় দেয় না। ঘড়ি আমার অনেকগুলো। এক একটা এক এক কাজে ব্যবহার করি। যাও, নিজের কাজ করো গে।'

জিঞ্জির খান তার প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল শিকদার, 'অজ্ঞান লোকটার খবর কি?'

'এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার।'

সন্ধ্যার খানিক আগে আমীর খান মাছরাঙায় উপস্থিত হলো। কুয়াশার পাঠানো

রেডিওগ্রামের কপিগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে সে। চার জায়গায় একই মেসেজ পাঠিয়েছে কুয়াশা। একটা পাঠিয়েছে সে আকলাভিকস্থ (Aklavik) রয়েল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেন্ট পুলিস ব্রাঞ্চে। আলকাভিক ম্যাকেঞ্জি নদীর তীরে অবস্থিত—আর্কটিক উপকূলের নিকটবর্তী স্থান। বাকি তিনটে পাঠিয়েছে আলাস্কা এবং অ্যালিউটিয়ান আইল্যাণ্ডস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে।

রেডিওগ্রামের বক্তব্য হুবহু এই রকম:

প্লিজ সেণ্ড অ্যাডেলেবল ইনফরমেশন রিগার্ডিং আইস এক্সপিডিশন অর এনি আদার এক্সপিডিশন অপারেটিং থ্রু ইওর টেরিটোরি উইদিন লাস্ট সিক্স মান্থস্ স্টপ হ্যাভ ইউ এনি রেকর্ড অব অ্যাবনরম্যালি রেড-স্কিনড ম্যান, হুজ হ্যাণ্ডস্ আর হোয়াইট, ফাইন গোল্ডেন হেয়ার, টল বোনি রিমার্কেবলি স্ট্রং, ফ্ল্যাট আনন্যাচারাল ভয়েস হোয়েন স্পিকিং বেঙ্গলী, নোন্ পারহ্যাপস্ অ্যাজ উলন স্টপ দিস ইনফরমেশন ইজ অফ আটমোস্ট আর্জেন্সী স্টপ ড. মনসুর আলী বাংলাদেশ।

পড়া শেষ করে উলন মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'হুঁ। বুঝেছি। রেডিওগ্রামের উত্তর আসার আগেই শয়তানটাকে বিদায় নিতে হবে দুনিয়া থেকে!'

সি, আই, ডি, অফিসার মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশ আর সকলের মত কুয়াশাও ধরতে পারেনি। কিন্তু লোকটার যখন টেলিফোনের রিসিভারটা টেবিলের উপর ফেলে দেয় তখন কুয়াশা একটা ব্যাপার লক্ষ করে। লোকটা মাউথপীসের ভিতর ডান হাতের মুঠো থেকে পাউডার জাতীয় কিছু ফেলে দিচ্ছে দেখতে পায় সে। সন্দেহ হয় তার। শহীদকে অনুসরণ করতে বলে সে। তারপর ফোনের রিসিভারটা বদলে ফেলে।

খানিক পর ফোন আসে। কুয়াশাও ফোন ধরে। ইচ্ছা করেই সে হাত থেকে রিসিভারটা ফেলে দেয়। সেই সঙ্গে কামালও চিৎকার করে ওঠে। এসবই ছিল ওদের অভিনয়। শত্রুদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করার কৌশল মাত্র।

রাত দশটা বাজতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী।

কুয়াশা উত্তরমেরুর মানচিত্র সামনে নিয়ে বসে আছে। পাশে রয়েছে রাজকুমারী, কামাল,রাসেল এবং ডি. কস্টা।

শহীদের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনের বেল। ডি. কস্টা কৃত্রিম ভয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বলে উঠল, 'এগেন এনিমিরা কোন ষড়যন্ত্র করিটে চায় বোচ হয়।'

ফোন ধরল কুয়াশা।

দ্রুত কণ্ঠে একটা লোক বলতে লাগল, 'আপনি কুয়াশা, আমি জানি। আমার পরিচয় জানার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখুন, আমি ইউনুস মিয়ার বন্ধু। তাকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে আমি দেখে নেব। কিন্তু আমার ক্ষমতা কম। তাই ওদের সঙ্গে পেরে উঠছি না। আমি…।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

লোকটা কুয়াশার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে চলল, 'আমি যাদের শত্রু বলে

মনে করি আপনারাও তাদেরকে শত্রু বলে মনে করেন। স্টেশন রোডে চলে যান। একটা লাল মরিস দেখতে পাবেন। ওই পথ দিয়েই যাবে মরিসটা। এখন থেকে দশ মিনিট পর। গাড়িটায় থাকবে উলন···।'

'এ খবর পেলেন কোথায় আপনি?'

উত্তর না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল লোকটা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে কুয়াশা বলল, 'ব্যাপারটা ফাঁদও হতে পারে। তবু, চলো সবাই, দেখা যাক উলনকে ধরা যায় কিনা।'

দশ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে স্টেশন রোডে পৌঁছে গেল কুয়াশার কালো রঙের প্রকাণ্ড মার্সিডিজ। রাস্তার এক পাশে গাড়ি পার্ক করল কুয়াশা। গাড়িটা থামার পরপরই রাজকুমারী পাশ থেকে বলে উঠল, 'ওই যে! লাল মরিস!'

'উলনকেও দেখা যাচ্ছে।'

কামাল বলে উঠল পিছনের সীট থেকে। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তীর বেগে ছুটে গেল একটা লাল মরিস রাস্তার মাঝখান দিয়ে।

মার্সিডিজ ছুটতে শুরু করল। কুয়াশা নিপুণ হাতে চালাতে শুরু করেছে গাড়ি। লাল মরিস বহুদূর চলে গেছে। অবশ্য মার্সিডিজের স্পীডও বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। কামাল, রাজকুমারী, ডি. কস্টা, রাসেল—সবাই জানে কুয়াশার কাছ থেকে মরিসের পালাবার কোন উপায় নেই।

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়ল মার্সিডিজ। কুয়াশা ছাড়া প্রত্যেকের হাতে রিভলবার বেরিয়ে এসেছে।

কুয়াশা বলে উঠল, 'গুলি কোরো না। প্রায় আশি মাইল স্পীডে ছুটছে মরিস। গুলি করে চাকা ফাটিয়ে দিলে আরোহীরা কেউ বাঁচবে না।'

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে মার্সিডিজ ম্যাক্সিমাম স্পীডে ছুটছে। মিনিট সাতেক পর ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার। মরিস প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল, এখনও তাই আছে, অর্থাৎ দূরত্ব কমছে না। এদিকে মার্সিডিজের স্পীড মিটারের কাঁটা একশোর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে।

'মরিসের নিচে পাওয়ারফুল ইঞ্জিন রয়েছে ওদের।'

কুয়াশা বলল। আরও বাড়াল সে স্পীড।

দূরত্ব একটু কমল বটে, কিন্তু মরিস ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। রাজকুমারীর চিৎকার সকলের কানে ঢুকল সেই সময়, 'কুয়াশা! ধোঁয়া!'

চিৎকার করে না উঠলেও চলত রাজকুমারীর। সবাই দেখতে পেল মরিসের পিছনের এগজস্ট পাইপ থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে কালো ধোঁয়া সামনের রাস্তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিল।

মার্সিডিজের স্পীড একটু কমাল বটে কুয়াশা, কিন্তু খুব সামান্যই। উলনকে পালিয়ে যেতে দিতে রাজি নয় সে। ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে ছুটছে গাড়ি।

সামনের দৃশ্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। পরিচিত রাস্তা, স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে গাড়ি চালাচ্ছে কুয়াশা।

পিছনের সীটে কামাল, ডি-কস্টা এবং রাসেল দম বন্ধ করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায়, বিপদের আশঙ্কায়, বিস্ফারিত ওদের তিনজোড়া চোখ। রাজকুমারী কুয়াশার পাশে বসে চোখ দুটো একবার বুজছে, পরমুহূর্তে খুলছে। রাজকুমারী ওমেনার অসাধারণ গুণ আছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা করলে ভবিষ্যৎ দেখতে পায় সে, দেখতে পায় সামনের বিপদকে। চোখ বুজে সামনের রাস্তার অবস্থা জানার চেষ্টা করছে সে, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছে কুয়াশাকে, ডান দিকে, সামান্য বাঁ দিকে···এবার বড় একটা গর্ত ডান দিকে···।

কুয়াশা গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাজকুমারীর নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চালাচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইলটা বিদ্যুৎবেগে একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরছে।

হঠাৎ রাজকুমারী চিৎকার করে উঠল, 'সামনে বাধা! সবাই একসাথে দেখতে পেল বিপদটা। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিশ্চল ট্রাক। ধোঁয়ার জন্য আগে দেখা যায়নি ট্রাকটাকে। মাত্র বিশ গজ সামনে সেটা। রাস্তার দু'পাশেই গভীর খাদ।

পলকের মধ্যে সবাই বুঝতে পারল—প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব! এরপর চিন্তা করার শক্তি রইল না কারও। ডি. কস্টা, কামাল এবং রাসেল ডান দিকে ছিটকে পড়ল। তিনজনের মাথা ঠুকে গেল গাড়ির জানালার সঙ্গে। তীব্র শব্দ উঠল কংক্রিটের রাস্তার সঙ্গে মার্সিডিজের চাকার ঘর্ষণে। তারপর, গোটা গাড়িটা বাঁ দিকে কাত হয়ে গেল। মনে হলো উল্টে যাচ্ছে গাড়িটা। ডি. কস্টার চিৎকার শোনা গেল, 'ওহ গড।'

পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল যেন সব কিছু। শোনা গেল কুয়াশার শান্ত কণ্ঠস্বর, 'কে কোথায় ব্যথা পেলে?'

সীটের নিচে পড়ে গিয়েছিল সবাই। রাজকুমারী সামনের সীটে উঠে বসল। পিছনের সীটে উঠে বসল বাকি সবাই। সবাই অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল, সামনে পরিষ্কার রাস্তা। না আছে ধোঁয়া, না আছে ট্রাক। মার্সিডিজ তীরবেগে ছুটছে। লাল মরিসটাকে দেখা যাচ্ছে সামনে। মাত্র দশ গজ সামনে এখন সেটা।

কুয়াশা বলল, 'বড় জোর বেঁচে গেছি। ট্রাকের বাঁ দিকে মাত্র হাত তিনেক জায়গা ছিল। তিন হাত জায়গা দিয়ে কি আর গাড়ি চালানো যায়। তাই করলাম কি জানো? গাড়ির বাঁ দিকটা শূন্যে তুলে ফেললাম। ডান দিকের চাকাগুলো রইল ওই তিনহাত জায়গায়—গাড়ি সম্পূর্ণ কাত করে পেরিয়ে এলাম বিপদটা।'

কথা বলছিল বটে কুয়াশা, কিন্তু মার্সিডিজের স্পীড ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল।

তৈরি হলো ওরা। মরিসকে ধরা এখন খুবই সহজ।

'রেডী!'

এক মুহূর্ত পরই দেখা গেল মরিসের পাশে পৌঁছে গেছে মার্সিডিজ।

'উলন কোথায়? এ লোক উলন নয়!' চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী। মরিসের আরোহীদের দেখা যাচ্ছে। মোট দু'জন। একজন গাড়ি চালাচ্ছে, সে দেখতে হুবহু শিকদারের মত। তার পাশে যে বসে আছে সেও হুবহু উলনের মত দেখতে।

কুয়াশা রাজকুমারীর কথা শুনেও যেন শুনল না। হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর বিপদের

সম্মুখীন হলো। মরিসের ড্রাইভার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দ্রুতবেগে মরিসের স্টিয়ারিং ঘুরাচ্ছে সে।

দুর্ঘটনা অনিবার্য। কুয়াশা উন্মাদের মত স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হলো না।

প্রচণ্ড শব্দ হলো দুটো গাড়ির সংঘর্ষে। গাড়ির ভিতর টর্নেডো শুরু হলো যেন। ডি. কস্টার পা দুটো উঠে গেল উপরে, মাথাটা নেমে গেল সীটের নিচে। রাসেলের দেহটা একবার ডান দিকের কোণায় গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে, পরমুহূর্তে ছিটকে যাচ্ছে বাঁ দিকের কোণায়...

এরপর মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে পড়ল শেষবার তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে।

সবাই যে-যার জায়গায় উঠে বসল। কি যে ঘটেছে তা কেউ বুঝতে পারেনি এখনও।

ওমেনা, 'ড্রাইভিং সীটে বসো তুমি। গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও আস্তানায়।'

কথাগুলো বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল কুয়াশা। অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কুয়াশা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'উপায় নেই। কুয়াশার আদেশ শিরোধার্য।'

রাজকুমারী গাড়ি ঘুরিয়ে নিল, ছুটে চলল শহরের দিকে।

রাস্তা থেকে নীচু ধানখেতে নেমে গেছে ইতিমধ্যে কুয়াশা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে অদূরে। সেই আগুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে মরিসটার দু'জন আরোহীকে দেখতে পেল। দু'জনই মারা গেছে। মরিসের গায়ে আগুন ধরে গেছে, সেই আগুন গ্রাস করছে লাশ দুটোকে।

মার্সিডিজকে রাস্তা থেকে ফেলে দিতে গিয়ে নিজেদের গাড়ির তাল ঠিক রাখতে পারেনি ওরা, ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

চেয়ে চেয়ে দৃশ্যটা দেখছিল কুয়াশা। এমন সময় একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন কানে ভেসে এল। ঝট্ করে তাকাল সে আকাশের দিকে। ঠিক মাথার উপর একটা টু-সিটার হেলিকপ্টার উড়ছে, দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে।

গাছের গায়ের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে রইল কুয়াশা। মিনিট তিনেক শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার পর হেলিকপ্টারটা ফিরে যেতে শুরু করল। কুয়াশা তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে 'কপ্টারটা। খানিক দূর যাবার পর শূন্যে দাঁড়াল, তারপর নিচে নামতে শুরু করল।

গাছের নিচে থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল কুয়াশা। হেলিকপ্টার কোথায় নেমেছে অনুমান করতে পেরেছে সে। দেখতে চায় আরোহীদের উদ্দেশ্য কি।

মিনিট দু'য়েক হাঁটার পরই 'কপ্টারটাকে দেখতে পেল কুয়াশা। মাটির উঁচু একটা ঢিবির উপর নেমেছে সেটা।

সন্তর্পণে ঢিবির গা বেয়ে উপরে উঠল কুয়াশা। কাছাকাছি থেকে দেখল, কেউ নেই 'কপ্টারের ভিতর। ঢিবির অপরদিকে গিয়ে পৌঁছুল সে। নিচে দেখা যাচ্ছে

একটা বাড়ি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটা জানালা দেখা যাচ্ছে—খোলা। হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

ঢিবি থেকে নিঃশব্দে নামতে শুরু করল কুয়াশা। কালো আলখেল্লা বাতাসে উড়ছে তার। রহস্যময়, অলৌকিক একটা মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাকে।

কোথাও কোন শব্দ নেই। বাড়িটার চারপাশে বড় বড় গাছপালা।

ঢিবি থেকে নেমে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। দু'জন লোক কথা বলছে নিচু গলায়। লোক দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না কুয়াশা। একজন লোক 'কুয়াশা' শব্দটা উচ্চারণ করল। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় লোকটা বলে উঠল, 'জহীর, হেলিকপ্টারে সুবিধে হবে না। আমরা যেখানে যেতে চাই সেখানে হেলিকপ্টার নামানো সম্ভব নয়। চলো, গাড়ি নিয়ে বাই রোডে যাই।'

'তাই চলো।'

কথাগুলো বেশ জোরে জোরে বলল ওরা। তারপর তাদের ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। কুয়াশা অনুসরণ করল তাদেরকে। কিন্তু লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল না সে। খানিক পরই থমকে দাঁড়াল সে। রাস্তাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রাস্তার দিক থেকে একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ ভেসে এল। এখন আর অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

বাড়িটার কাছে ফিরে এল কুয়াশা। নিঃশব্দে প্রবেশ করল ভিতরে। প্রতিটি কামরা পরীক্ষা করল সে। সবগুলোই খালি—মাত্র একটি ছাড়া। সেই কামরায় ঢুকে কুয়াশা দেখল টেবিলের উপর জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র পড়ে রয়েছে। মানচিত্রও দেখা যাচ্ছে কয়েকটা।

টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনটা সামনে টেনে এনে কাগজপত্র এবং মানচিত্রগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ল সে।

কাগজপত্র এবং মানচিত্রগুলো দেখতে এমনই মগ্ন হয়ে পড়ল কুয়াশা যে হ্যারিকেনের ভিতর থেকে হালকা হলুদ রঙের মৃদু মৃদু ধোঁয়া বের হচ্ছে তা তার নজরেই পড়ল না।

অবশ্য আরও খানিক পর, ব্যাপারটা লক্ষ করল সে ঠিকই। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিধে হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। তার হাতটা বিদ্যুতের মত নড়ে উঠল। হাতের ধাক্কায় হ্যারিকেনটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে, সেখান থেকে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। নিভে গেল সেটা তারও আগে।

কুয়াশা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। টলে উঠল দীর্ঘ, প্রকাণ্ড দেহটা। কিছু একটা ধরার জন্য হাত দুটো সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে বাতাসে ছটফট করল কিছুক্ষণ, তারপর সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল দেহটা।

নিঃসাড়, মৃতবৎ পড়ে রইল কুয়াশা অন্ধকার কামরার মেঝেতে।

কুয়াশা ৫৪

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৭৬

এক

কুয়াশার পতনের শব্দ হবার পরপরই দুটো টর্চ জ্বলে উঠল। লাফাতে লাফাতে কামরার ভিতর প্রবেশ করল উলন এবং শিকদার।

কুয়াশা যাদের কথা শুনেছিল ঢিবি থেকে নামার পর তারা আর কেউ নয়, উলন এবং শিকদারই। কুয়াশা আশেপাশেই আছে অনুমান করে অভিনয় করছিল ওরা, কুয়াশাকে ভুল বুঝিয়ে ফাঁদে ফেলবার জন্যই তাদের এই অভিনয়।

'বাছাধন এবার আর ফাঁকি দিতে পারেনি আমার বিষকে!' উলন বলে উঠল।

'কিন্তু সত্যি মরেছে তো?'

শিকদার কুয়াশার সামনে বসে পড়ল। বসল উলনও।

পরমুহূর্তে কি যে ঘটল, বুঝতে পারল না ওরা। উলন এবং শিকদারের মাথা প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল পরস্পরের সঙ্গে। টুঁ-শব্দ করবারও ফুরসত পেল না তারা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল দু'জনই।

মেঝে থেকে টর্চ তুলে নিয়ে জ্বালল কুয়াশা। মরেনি বা জ্ঞানও হারায়নি সে। সে-ও অভিনয় করছিল এতক্ষণ। কাগজপত্রগুলো আলখেল্লার পকেটে ভরে নিয়ে দুই কাঁধে দুটো অজ্ঞান দেহ তুলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা।

মাটির ঢিবিতে উঠে হেলিকপ্টারের সামনে থামল কুয়াশা। দেহ দুটো নামিয়ে রেখে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করতে গিয়ে একটা টাইম বোমা আবিষ্কার করল সে। স্টার্ট নেয়া মাত্রই বোমাটা বিস্ফোরিত হবার কথা।

বোমা আরও আছে কিনা পরীক্ষা করল কুয়াশা। নিশ্চিত হয়ে হেলিকপ্টারের সীটের উপর তুলে দিল অচেতন দেহ দুটো। তখুনি 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উড়ল না সে। আলো অন করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উলনের হাত দুটো, বিশেষ করে ডান হাতটা, পরীক্ষা করল সে।

কিন্তু অসাধারণ কিছুই পেল না সে হাতটায়। হাতের সাদা রঙটা যেন অকৃত্রিম বলেই মনে হয়।

পকেট থেকে সিরিঞ্জ এবং অ্যামপুল বের করল কুয়াশা। দু'জনের শরীরে ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করল সে। তারপর স্টার্ট দিল হেলিকপ্টারে।

হেলিকপ্টার নিয়ে নিজের আস্তানার ছাদে নিরাপদে ল্যাণ্ড করল কুয়াশা।

কুয়াশার ড্রয়িং রুম। মেঝের উপর উলন এবং শিকদারের অচেতন দেহ পড়ে রয়েছে।

কুয়াশা সোফায় বসে তার পাঠানো রেডিওগ্রামের উত্তর সম্বলিত কাগজপত্র পড়ছে। খানিক আগে উত্তরগুলো এসেছে।

প্রতিটি মেসেজ দীর্ঘ এবং বিশদ। চার জায়গা থেকেই উত্তর এসেছে—আইস অভিযান ছাড়া আর কোন অভিযান গত ছয় মাসের মধ্যে উত্তর মেরুর গভীরতম এলাকায় পরিচালনা করা হয়নি। আইস অভিযানের অভিযাত্রীদের ভাগ্য সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য দিতে পারেনি। তবে অভিযাত্রীদের একজন শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে, লোকটার চেহারার বর্ণনা রয়েছে একটা মেসেজে।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, চেহারার বর্ণনাটা শিকদার মাহবুব উল্লাহর সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তারমানে আইস অভিযানের একমাত্র জীবিত সদস্য স্বয়ং শিকদার—ওরফে ইকবাল। এই মেসেজে আরও জানানো হয়েছে, ইকবাল ওরফে শিকদারের সঙ্গে একজন লোককে মাঝে মধ্যে দেখা গেছে। এই লোকটারও চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে উলনের।

পয়েন্ট ব্যারো, নর্থ আলাস্কান উপকূল থেকে যে মেসেজটা এসেছে তাতে উলন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। লালচে রঙের ত্বকবিশিষ্ট, সাদা হাতওয়ালা একটা লোক রহস্যজনকভাবে কোথা থেকে কেউ জানে না ওখানকার আমেরিকান গবেষণাগারে উপস্থিত হয় কয়েক মাস আগে। লোকটার কাছে অদ্ভুত আকৃতির একটা কালো গগলস্ দেখা গেছে। তার আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ রহস্যময়। আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, মনে হয়েছিল। পৃথিবীর কোন প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে পারত না সে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিজেকে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নেয় সে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে শিখে ফেলে ইংরেজি ভাষাটা। লোকটা নিজের সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে রাজি হয়নি কখনও। সে শুধু বলত, উত্তর মেরুর অভ্যন্তর ভাগ থেকে এসেছে সে। বলাই বাহুল্য, কথাটা মিথ্যে। কারণ উত্তর মেরুর গভীরতম অভ্যন্তরে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। লোকটা যেমন রহস্যজনকভাবে এসেছিল তেমনি রহস্যময়ভাবে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়।

এর কিছুদিন পর এলাকার এস্কিমোরা গবেষণাগারের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করে যে তাদের কিছু লোককে হত্যা করেছে রহস্যময়, লালচে গায়ের রঙ বিশিষ্ট, সাদা হাতওয়ালা একজন লোক। কিন্তু এস্কিমোরা সেই লোককে ধাওয়া করেও ধরতে পারেনি। তারপর লোকটা সম্পর্কে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

কুয়াশা মেসেজগুলো পড়ে মুখ তুলল। বলল, 'আমরা উত্তর মেরু জয় করতে যাচ্ছি, রাজকুমারী। মি. ডি. কস্টা, তৈরি হোন।'

কামাল এবং রাসেল একযোগে বলে উঠল, 'সত্যি!'

কুয়াশা অপ্রত্যাশিতভাবে আদেশ দিল, 'মি. ডি. কস্টা! লাফ দিন!'

কালবিলম্ব না করে, নিজের জায়গা থেকে লাফ দিল ডি. কস্টা। কিন্তু যা ঘটবার ঘটে গেছে ততক্ষণে। শূন্যে থাকতেই উলনের একটা হাত ডি. কস্টার ডান

হাতটা ধরে ফেলেছে।

'সাবধান, নড়বেন না!' কুয়াশা বলে উঠল ডি. কস্টার উদ্দেশ্যে।

ডি. কস্টা শূন্যে উঠে গিয়েছিল লাফ দিয়ে কুয়াশার নির্দেশ পেয়েই। সোফাতেই পড়েছে সে।

হাসছে উলন। প্রস্তর মূর্তির মত যে যার জায়গায় বসে আছে সবাই। এতটুকু নড়ছে না কেউ। কুয়াশাও যেন পাথর বনে গেছে। ডি. কস্টা পিটপিট করে চেয়ে আছে উলনের দিকে। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই তার মধ্যে।

কথা বলে উঠল উলন, 'তুমি বুদ্ধিমান, কুয়াশা। জানোই তো, আমার ক্ষমতা অসাধারণ। চালাকি করবার চেষ্টা করে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলব তোমার সহকারীকে। ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই যথেষ্ট।'

'কি চাও তুমি?'

'এই তো লাইনে এসেছ। প্রথমে চাই গগল্‌স্‌টা। তারপর আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। দেখো, আমি একবারে একটা কাজ করি। ইচ্ছা করলে এই সুযোগে তোমার স্পেসক্রাফটটা আদায় করে নিতে পারতাম। কিন্তু তা করছি না। পরে আসব আমি স্পেসক্রাফটের জন্য। তোমার সহকারীকে নিচে নিয়ে যাব এখন আমি। কেউ আমাকে অনুসরণ করবে না। রাজি?'

কুয়াশার ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু, 'রাজি।'

ডি. কস্টা তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করে আনছিল, কুয়াশা গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিল, 'মি. ডি. কস্টা, পকেট থেকে হাত বের করুন—খালি হাত!'

ডি. কস্টা বের করল না হাত। বলল, 'বস্‌ হামি হাপনার পরাজয় মানিয়া নিটে পারিটেছি না। বিলিভ মি, হামি এই উজবুক ব্যাটাকে ভয় করি না। হাপনি অনুমটি ডিন···।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'না। যা বলছি শুনুন।'

তবু দ্বিধা করতে দেখা গেল ডি. কস্টাকে। কুয়াশা প্রমাদ গুণল মনে মনে। ডি. কস্টাকে চেনে সে। ভয় বলে কোন জিনিস নেই লোকটার ভিতর। কি না কি করে বসে···।

'বের করুন খালি হাত!' ধমকে উঠল কুয়াশা। ডি. কস্টা গম্ভীর ভাবে বসে রইল। হাত বের করছে না সে। তারপর, আস্তে আস্তে হাতটা বের করল সে। খালি হাত।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। পা বাড়াল লাইব্রেরি রুমের দিকে। যাবার সময় বলল, 'নড়বেন না। এটা আমার আদেশ।'

ফিরে এল কুয়াশা লাইব্রেরি থেকে অদ্ভুত আকৃতির গগল্‌স্‌টা নিয়ে। সেটা ছুঁড়ে দিল উলনের দিকে। বলল, 'আর কি বক্তব্য আছে তোমার?'

'একটা বক্তব্য আছে। শিকদারের বদলে তোমাকে যদি বন্ধু হিসেবে পেতাম, তাহলে আমার উদ্দেশ্য সুচারুভাবে এবং আরও অল্পসময়ে বাস্তবায়িত হত।'

হাসল কুয়াশা।

শিকদারের অচেতন দেহটা ডান হাত দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল উলন নিজের কাঁধে। তার এই কাণ্ড দেখে স্বয়ং কুয়াশাও বিস্ময় মানল। কঙ্কালসার একটা লোকের গায়ে এমন অস্বাভাবিক শক্তি থাকতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।

উলন অপর হাতে ধরে রেখেছে ডি. কস্টাকে।

'বিদায়। কেউ যদি আমাকে অনুসরণ না করে তাহলে ডি. কস্টাকে আমি ঠিকই ছেড়ে দেব···।' বলতে বলতে করিডরে বেরিয়ে গেল উলন।

এক মিনিট কেটে গেল। কেউ নড়ল না এতটুকু, তারপর ছুটল কুয়াশা। এক লাফে করিডরে গিয়ে পড়ল। দীর্ঘ পদক্ষেপে ব্যক্তিগত এলিভেটরের দিকে ছুটল সে।

ইয়ট মাছরাঙা। শিকদারের জ্ঞান ফিরে এসেছে। উলনের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করছে সে। তার বক্তব্য, 'যতবারই কুয়াশাকে খুন করবার চেষ্টা করলাম, ততবারই ব্যর্থ হলাম। কিন্তু রহস্য থাকতে পারে এর পিছনে? দেখে শুনে মনে হচ্ছে, কুয়াশা যেন আগে থেকেই আমাদের ফাঁদের কথা, পরিকল্পনার কথা জেনে যাচ্ছে।'

এই সময় জিঞ্জির খান প্রবেশ করল কেবিনে।

নীচু গলায় কথা বলতে লাগল শিকদার, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি জিঞ্জির খানের দিকে, 'এই হাতির মত লোকটাকে কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমার। উলন, এ লোক কুয়াশার দলের কেউ নয় তো?'

উলন হাসল, 'সন্দেহ রেখে লাভ কি। তুমি চাইলে ওর সঙ্গে করমর্দন করতে পারি।'

কথাটার অর্থ খুবই সোজা। উলনের করমর্দন করা মানে প্রতিপক্ষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু।

শিকদার বলল, 'কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আমি। লোকটা হয়তো সত্যি নির্দোষ। কিন্তু উপায় কি। উলন, দাও ওকে খতম করে। ব্যাটা একটা উপকার করে ঘাড়ে চেপে বসেছে—নড়বার নাম নেই।'

উলন সহাস্যে জিঞ্জির খানকে জোর গলায় ডাকল, 'জিঞ্জির খান, এদিকে এসো। তোমার জন্য সুখবর আছে।'

এগিয়ে এল জিঞ্জির খান। হাসছে সে।

'তোমাকে আমরা আমাদের দলে নেব, ঠিক করেছি। তোমার কি মত?'

জিঞ্জির খানের মস্ত দেহটা নড়ে উঠল। সশব্দে হেসে বলল সে, 'সে তো আমার সৌভাগ্য।'

উলন বলল, 'আজ থেকে তুমি আমাদের দলেরই একজন অনুচর। এসো···।'

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল উলন।

জিঞ্জির খান যেন এই রকম একটা কিছুর জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এল সে। তারপর বিদ্যুৎ বেগে ডান পা তুলে সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মারল

উলনের পাঁজরে।

ফুটবলের মত নিক্ষিপ্ত হলো উলনের দেহটা। দেয়ালে গিয়ে সশব্দে ধাক্কা খেলো, তারপর পড়ল মেঝেতে। কিন্তু মাত্র এক সেকেণ্ড পরই দেখা গেল উলন দাঁড়িয়ে আছে কেবিনের মেঝের উপর। তার ডান হাতটা ক্রমশ উপরে উঠছে। বাতাসে ভর দিয়ে, ফড়িংয়ের মত উড়তে শুরু করছে সেটা।

শিকদার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'কুয়াশা! কুয়াশা! জিঞ্জির খান না—এ লোক স্বয়ং কুয়াশা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল শহীদ খান।

'একটা চেয়ার তুলে সামনে ধরো শহীদ! উলনের ছোঁয়া মানেই মৃত্যু!'

সতর্ক করে দিল কুয়াশা। শিকদার তার কোটের গোপন পকেট থেকে বের করে ফেলেছে ইতিমধ্যে বড় আকারের একটা টাইমপীস। টাইমপীসের মাঝখানে একটা ক্ষুদ্র বোতাম। টাইমপীসটা বাড়িয়ে ধরে বোতামটায় চাপ দিতেই তীব্রবেগে তরল অ্যাসিড ছুটে গেল শহীদের দিকে। লাফ দিয়ে সরে গেল শহীদ। দাঁড়াল একটা চেয়ারের পিছনে, সেটা তুলে নিল দ্রুত। তারপর পা বাড়াল শিকদারের দিকে।

কুয়াশার লাথি খেয়ে উলনের যেন কিছুই হয়নি। এগিয়ে আসছে সে। তার ডান হাতটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে উড়ছে বাতাসে ভর দিয়ে।

আলখেল্লার পকেট থেকে ছোট্ট একটা গ্যাস বোমা বের করে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল কুয়াশা।

উলন চিৎকার করে উঠল শিকদারের দিকে তাকিয়ে, 'দম বন্ধ করে রাখো শিকদার।'

উলন শিকদারের দিকে তাকাতেই সুযোগটা নিল কুয়াশা। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল সে। উড়ন্ত দানবের মত দেখাল তাকে। দুই পা দিয়ে শূন্য থেকে উলনের বুকের উপর জোড়া লাথি মারল।

ছিটকে পড়ে গেল উলন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে দাঁড়াল আবার। তাজ্জব হয়ে গেল কুয়াশা, লোকটার মরে যাবার কথা তার জোড়া লাথি খেয়ে! অথচ···।

আবার এগিয়ে আসছে উলন। ডান হাতটা এখন আরও দ্রুত, আরও অস্থির ভাবে উড়ছে। সাপের মত ফণা তুলে আছে হাতটার আঙুলগুলো। সুযোগ পেলেই সে মৃত্যু ছোবল মারবে।

এদিকে শিকদারের অ্যাসিডের ছোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে শহীদ। দুই হাত দিয়ে চেয়ারটা নিজের সামনে ধরে রেখেছে সে। পিছিয়ে যেতে যেতে দেয়ালে পিঠ ঠেকল ওর। শিকদার হাসছে। কুৎসিত মুখটা ভিজে গেছে ঘামে। টাইমপীসটা তার প্রিয় অস্ত্র। অ্যাসিড ছোঁড়ার জন্য এই টাইমপীসই ব্যবহার করে সে।

'এবার কোথায় যাবে বাছাধন!'

শিকদার দাঁতে দাঁত চেপে হাতের টাইমপীসটা বাড়িয়ে ধরল সামনের দিকে। ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ খেলে গেল শহীদের দেহে। চোখের পলকে শহীদের হাত থেকে চেয়ারটা উড়ে এসে লাগল শিকদারের মাথায়। পড়ে গেল সে।

দেয়ালের কাছ থেকে লাফিয়ে শিকদারের বুকের উপর এসে বসল শহীদ।

এমন সময় কুয়াশার গলা কানে ঢুকল ওর, 'শহীদ!'

ঘাড় ফিরিয়ে শহীদ দেখল, উলন তার ডান হাত বাতাসে নাচাতে নাচাতে ছুটে আসছে তার দিকে।

লাফ দিয়ে সরে গেল শহীদ। ঠিক একই সময়ে লাফ দিল কুয়াশা। উলনের পাঁজরে পরপর আড়াই মণ ওজনের দুটো ঘুসি মারল সে ডান এবং বাঁ হাত দিয়ে, উলন পড়ে গেল ঘুসি খেয়ে।

কিন্তু আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে শিকদারও। নাক মুখ কেটে রক্ত ঝরছে তার। উলনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে। পরমুহূর্তে তীরবেগে ছুটল দু'জন দরজার দিকে।

ধাওয়া করল কুয়াশা এবং শহীদ।

ডেকে বেরিয়ে ওরা পলকের জন্য দেখতে পেল শত্রুদেরকে। ডেকের রেলিং পেরিয়ে নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দু'জনই।

রেলিংয়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল কুয়াশা এবং শহীদ। পরমুহূর্তে এক ঝাঁক স্টেনগানের বুলেট ওদের মাথার কাছ দিয়ে ছুটে গেল।

রেলিংয়ের কাছ থেকে পিছিয়ে এল ওরা।

'আগে থেকেই মটরবোটটা তৈরি করে রেখেছিল ওরা। স্টেনটাও রাখতে ভোলেনি।'

পরমুহূর্তে শোনা গেল মটরবোট স্টার্ট নেবার শব্দ।

'ওই পালাচ্ছে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল শহীদ।

এক ঘণ্টা পর নয়জন আরোহীকে নিয়ে একটা চার্টারড বিমান চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে টেক অফ করল। কুয়াশার নির্দেশে দু'ঘণ্টা পর এয়ারপোর্টে এসে সন্ধান চালাতে গিয়ে কামাল খবরটা সংগ্রহ করল। আরোহীদের চেহারার বর্ণনা শুনে কুয়াশা বুঝতে পারল শিকদার এবং উলনের দল দেশ ত্যাগ করেছে।

সেই মুহূর্তে সকলকে দ্রুত প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল কুয়াশা। বলল, 'উত্তর মেরুতে টিকে থাকার জন্য যাবতীয় যা দরকার—সব সঙ্গে নাও। অস্ত্র-শস্ত্র বেছে নেব আমি। আমরা রহস্যময় একটা অলৌকিক মহাশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি।'

দুই

মেঘ মুক্ত নির্মল আকাশ। রূপোর চাকতির মত একটা আকাশযান আকাশের গায়ে লেপটে রয়েছে যেন। আকাশের গায়ে চরছে যেন সেটা ধীরে ধীরে। কয়েক হাজার ফুট নিচে সাদাটে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। আরও নিচে শক্ত, পাথরের মত বরফ। বরফ আর বরফ। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় বরফের সাগর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বার নয়। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বরফের মাঝখানে ধূসর রঙের লম্বা, এবড়োখেবড়ো, আঁকাবাঁকা দাগ। ওগুলো বরফের রাজ্যে পাথরের পাহাড়।

দু'শো মাইল স্পীডে উড়ছে কুয়াশার স্পেসক্রাফট। কানাডার উত্তর-পশ্চিমের আকাশে রয়েছে ওরা—কুয়াশা, শহীদ, কামাল, রাসেল, ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী ওমেনা।

গ্রেট স্লেভ লেকে নামল স্পেসক্রাফট। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে আলাপ করল শহীদ। কথায় কথায় শহীদ প্রশ্ন করল কয়েকটা। তারা জানাল পাইলট সহ দশজন আরোহী নিয়ে একটি বিমান ঘন্টা দুয়েক আগে রিফুয়েলিংয়ের জন্য নেমেছিল এয়ারপোর্টে।

কুয়াশাকে খবরটা দিতে সে বলল, 'শিকদার এবং উলনের দল।'

'দুই প্রাণের বন্ধু—হামাডের প্রাণের দুশমন!'

মন্তব্য করল ডি. কস্টা। ডি. কস্টার কোলের উপর আবেশে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে প্রিন্স। ডি. কস্টা তার নরম গায়ে সাদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এ হলো ডি. কস্টার পোষা কুকুরটা। নাম দিয়েছে সে প্রিন্স।

আবার উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু হলো। ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে স্পেসক্রাফট। কখনও আকাশে থামছে সেটা। রেডিও অন করছে কুয়াশা। কিছু শোনার প্রয়াস পাচ্ছে সে। তারপর আবার ছুটছে নির্মল আকাশ পথ ধরে সামনের দিকে, আরও সামনের দিকে। আলাস্কান বর্ডারের কাছাকাছি এসে স্পেসক্রাফট ক্রমশ আরও উপরে উঠে যেতে লাগল। ইউকন পর্বতমালা ঠিক নিচেই। নির্জন, প্রাণহীন বরফাচ্ছাদিত পার্বত্য এলাকার উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে দুঃসাহসী, মৃত্যুভয়হীন বাংলাদেশী অভিযাত্রীরা উত্তর মেরুর দিকে।

স্পেসক্রাফটের ভিতরে যে-যার কাজে মগ্ন সবাই। রাজকুমারী ওমেনা পরিচালনা করছে স্পেসক্রাফট। রাসেল রেডিও কমিউনিকেশনের দায়িত্বে রয়েছে। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে সে গ্রাউণ্ড স্টেশনগুলোর সঙ্গে, ওরা যে দুর্গম এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেখানকার আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

শহীদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে কুয়াশা। অভিযানের নেভিগেটর ও। চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত।

কোন দায়িত্ব নেই ডি.কস্টার। সে তার প্রিন্সের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা

করতেই অধিকাংশ সময় কাটাচ্ছে। কামাল কন্ট্রোলরুমে সাহায্য করছে রাজকুমারী ওমেনাকে।

ডি. কস্টা জানতে চাইল, 'এনিমিডের এগেনেস্টে হামরা হামলা চালাইব কখন, বলিটে পারেন, বস্?'

'পারি।'

ডি. কস্টা অবাক হলো, 'হোয়াট! হাপনি জানেন এনিমিরা কোঠায় যাইটেছে? হামার টো ঢারণা ছিল পয়েন্ট ব্যারো-এর পর অনুমানের উপর ডিপেণ্ড করিয়া অগ্রসর হইটে হইবে হামাডেরকে।'

কুয়াশা বলল, 'না, তা নয়। শিকদারের আস্তানায় জিঞ্জির খানের ছদ্মবেশে থাকার সময় কিছু তথ্য পাই আমি। আইস প্যাকের উপর দিয়ে বহুদূর যেতে হবে আমাদের। যাবার সময় আমরা ব্যবহার করব আমাদের রেডিও ডাইরেকশন ফাইণ্ডার। শিকদার উত্তর মেরুর কোন এক জায়গায় একটা রেডিও সেট অন করে রেখেছে, সেটা থেকে নির্দিষ্ট স্ট্যাটিক ডিসটারবেন্স সৃষ্টি হবে। আমাদের রেডিওতেও স্বভাবতই ধরা পড়বে সেই ডিসটারবেন্স। ওটার সন্ধান পেলেই আমরা শত্রুদের সন্ধান পাব।'

'ভেরি গুড। এনিথিং এল্স্? হোয়াট অ্যাবাউট ব্ল্যাক গগল্স্? অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যাবাউট ব্ল্যাক ভূট অর ব্ল্যাক থিংস?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'এসব ব্যাপারে এখনও বিশেষ কিছু জানতে পারিনি আমি।'

রাসেল হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'কুয়াশাদা, আপনার হুকুমে তো অভিযানে অংশ গ্রহণ করলাম—কিন্তু আমরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কি উদ্দেশ্যে, কিসের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি বলুন তো?'

কুয়াশা বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, রহস্যময় একটা শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি আমরা। এর বেশি কিছু এখনও জানি না আমি নিজেও।'

পয়েনন্ট ব্যারো উত্তর আলাস্কান উপকূল। পয়েন্ট ব্যারো-তে একটা এয়ারপোর্ট আছে, এটিই শেষ এয়ারপোর্ট। পয়েন্ট ব্যারো-কে সভ্যতার শেষ সীমা বলা যেতে পারে। আরও খানিকদূর অবধি এস্কিমোদের দেখা পাওয়া যায় বটে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তারা এখনও পরিচিত নয় তেমন।

ঢাকায় বসে পয়েন্ট ব্যারো থেকেই উলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেডিওগ্রামের মাধ্যমে পেয়েছিল কুয়াশা। আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য স্পেসক্রাফট নিয়ে নামার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্পেসক্রাফট নামার আগেই এয়ারপোর্টের কন্ট্রোলরুম থেকে রেডিও মেসেজ এল।

মেসেজটার মূল অর্থ, 'আমাদের এয়ারপোর্টে একটা অঘটন ঘটেছে। সে সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করে দেয়া দরকার। দয়া করে আপনাদের স্পেসক্রাফট নিচে নামান।'

কানাডা সরকারের অনুমতি নিয়ে বর্ডার ক্রস করেছে কুয়াশা। পয়েন্ট ব্যারো-র কর্মকর্তাদেরকে কুয়াশা, তার স্পেসক্রাফট ইত্যাদি সম্পর্কে আগেই অবহিত করানো হয়েছে। কুয়াশার সঙ্গে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে।

নেমে এল স্পেসক্রাফট। এয়ারপোর্ট ম্যানেজার জানাল, 'ঘণ্টা তিনেক আগে একটা বিমান ল্যাণ্ড করে এখানে। বিমান থেকে দশজন সশস্ত্র লোক নামে। অকারণে গোলাগুলি ছুঁড়ে কার্যরত লোকদের আতঙ্কিত করে তোলে তারা। রানওয়েতে একটা হেলিকপ্টার ছিল, সেটা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। রহস্যটা বোধগম্য হচ্ছে না। প্লেন রেখে হেলিকপ্টার নিয়ে গেল কেন, তাদের গন্তব্যস্থান কোথায়, কি উদ্দেশ্য তাদের···।'

কুয়াশাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল। বলল, 'বুঝেছি। বরফের উপর প্লেন ল্যাণ্ড করানো সম্ভব নয় বলে ওরা 'কপ্টার হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে।'

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে যতটুকু না বললে নয় ততটুকু বলল কুয়াশা উলন এবং শিকদারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তারপর সে উলন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করতে শুরু করল।

আলোচনার ফলে একজন ফার ব্যবসায়ীর কথা জানা গেল। ফার ব্যবসায়ী প্রৌঢ় স্কব উলনকে শুধু দেখেইনি, তাকে কিছু দিনের জন্য আশ্রয়ও দিয়েছিল।

লোক পাঠিয়ে দিল এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। আধঘণ্টা পর প্রৌঢ় স্কব হাজির হলো কুয়াশার সামনে।

পরিচয় করিয়ে দিল এয়ারপোর্ট ম্যানেজার।

প্রৌঢ় স্কব বলল, 'আপনার মত স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি গর্বিত···।'

কুয়াশা বলল, 'আমি উলন সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনতে চাই। শুনেছি, সে নাকি মেরুর গভীরতম এলাকা থেকে এখানে আসে?'

প্রৌঢ় বলল, 'সে তো তাই দাবি করেছিল। কিন্তু কথাটা মিথ্যে। ওদিকে কোন মানুষ বাস করতে পারে না। না আছে খাবার, না আছে জ্বালানি—বাঁচবে কিভাবে? বরফের মাঝে মাঝে চোরা-গর্ত, পা দিলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। ওদিকের আবহাওয়াও ভয়ঙ্কর—চব্বিশ ঘণ্টা ঝড় বইছে। মানচিত্রে জায়গাটাকে দেখানো হয়েছে সাদা শূন্যতা হিসেবে।'

'তোমার ধারণা কি? উলন তাহলে কোত্থেকে এসেছিল? তার জন্মস্থান কোথায়?'

প্রৌঢ় চুপ করে রইল। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বলল অবশেষে, 'আশ্চর্য জিনিস জীবনে কম দেখিনি, মি. কুয়াশা। কিন্তু উলনের মত আশ্চর্য প্রাণী আমি কখনও দেখিনি। লোকটা—ও ঠিক মানুষ নয়।'

'তার মানে?'

প্রৌঢ় বলল, 'ওর কিছু কিছু আচরণ সত্যি ব্যাখ্যার অতীত আগুনের কথাই

ধরুন। আগুন দেখে সে বিচলিত হয়ে ওঠে। হাত দিয়ে ধরতে যায় আগুনকে। জিজ্ঞেস করতে কি বলল জানেন? বলল, সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে নাকি আগুন নেই!'

চুপ করে রইল কুয়াশা। রহস্যের কিনারা হওয়া তো দূরের কথা, রহস্য যেন আরও ঘনীভূত এবং জটিল হয়ে উঠছে। পকেট থেকে উলনের অদ্ভুত আকৃতির গগল্‌স্‌টা বের করে প্রৌঢ়কে দেখাল সে, 'এটা আগে কখনও দেখেছ?'

'দেখিনি মানে! উলনের জিনিস! ওটা হাতে নিয়ে দেখছিলাম একদিন, উলন আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে কেড়ে নিল জোর করে। ভয়ানক দামী জিনিস ওটা উলনের। কিন্তু আমার কাছে কোন কাজেরই নয়। ওটা চোখে পরলে কিছুই দেখা যায় না। সেদিন উলনের ব্যবহার দেখে যেমন ভয়ও পেয়েছিলাম, তেমনি রাগও হয়েছিল। রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছিলাম ওর বুকের দিকে, বলেছিলাম বিদায় হয়ে যেতে। মাত্র হপ্তা দুয়েক ছিল সে আমার কাছে। সেই ঘটনার পর তাকে আর দেখিনি।'

পয়েন্ট ব্যারো থেকে আকাশে উড়ল রূপালি স্পেসক্রাফট। বীনফোর্ট সীর উপর দিয়ে উত্তর দিকে উড়ছে এবার। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। নিচে, অনেক নিচে সাদা ধবধবে বিস্তীর্ণ, সীমাহীন বরফের কঠিন সমতলভূমি। আশি-নব্বই মাইল সামনে আর্কটিক মহাসাগর।

কুয়াশা রেডিও ডাইরেকশন ফাইণ্ডার সেট অন করল। লাউডস্পীকার থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত ধরনের যান্ত্রিক উচ্চকিত শব্দসমষ্টি। একঘেয়ে ঘরঘরে, পিক-পুক-পুক-পুক, শোঁ-সাঁ-শোঁ, দ্রুম-দ্রুম, তিরিক-চুই, তিরিক চুই—আশ্চর্য ধরনের শব্দে কান পাতা দায়।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটল এভাবে। নির্দিষ্ট স্ট্যাটিক ডিসটারব্যান্স বলতে যা বোঝায় তা এখনও কানে আসছে না। রেডিওটা অন করে রেখেছে কুয়াশা।

সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নির্দিষ্ট সিগন্যাল পাওয়ার উপর নির্ভর করছে সব। সিগন্যাল পাওয়া না গেলে শিকদার এবং উলনের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ জানবার উপায় নেই। এই বরফময় রাজ্যে কোথায় কি আছে তা জানা নেই সভ্য জগতের কারও।

আরও আধঘণ্টা পর রেডিওর শব্দ বদলে গেল। ট্রিক-টিক-টিক-ট্রিক, ট্রিক-টিক-টিক-ট্রিক। কুয়াশা ইন্টারকমের মাধ্যমে রাজকুমারীর কাছে নির্দেশ পাঠাল, 'পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে নাও স্পেসক্রাফট। আই মীন, নর্থ-ওয়েস্ট অ্যাঙ্গেলে এগোও। সিগন্যাল পাচ্ছি আমরা।'

স্পেসক্রাফট দিক পরিবর্তন করল। সেই সঙ্গে সিগন্যাল-এর শব্দ স্পষ্ট এবং উচ্চকিত হয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছে, সিগন্যালের উৎসের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

সবাই পরবর্তী ঘটনার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সিগন্যাল যখন পাওয়া গেছে তখন আর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এবার নামবে ওরা

বরফের রাজ্যে। কোন সন্দেহ নেই, শত্রুদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য ভাবে ঘটবে। শত্রুদের ধ্বংস করাই অবশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ওরা কয়েকটা রহস্যের সমাধান চায়। উলনের অলৌকিক ক্ষমতার স্বরূপ কি, কোথা থেকে আর্বিভাব ঘটেছে তার, এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দরকার। আর দরকার রহস্যময় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মহাশক্তির খবর।

একমাত্র ডি. কস্টাই এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। একটা জানালার সামনে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নরম সীটের উপর, তার পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে প্রিন্স। তাকে আদর করার কথাও ভুলে গেছে সে। মুগ্ধ, সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল।

'মাই গড!'

আমূল বদলে গেল ডি. কস্টার চেহারা। শক্ত হয়ে উঠল দেহ। মুখটা বাঁকা হয়ে যাওয়ায় বিকৃত দেখাচ্ছে। বুকের ভিতর যেন তড়পাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড।

ট্র্যান্সমিটারের পাশ থেকে রাসেল সহাস্যে বলে উঠল, 'কি হলো, মি. ডি. কস্টা? আপনার প্রিন্স পড়ে গেছে নাকি নিচে।'

ডি. কস্টা রাসেলের কথায় কান না দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বস! মি. শহীদ—এডিকে আসুন। কুইক।'

'কি ব্যাপার!' মুখ তুলে তাকাল শহীদ। চার্ট এবং ম্যাপ এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ও। উঠে দাঁড়াল কুয়াশাও। সবাই এগোল ডি. কস্টার দিকে।

'ডেকুন! মাই গড! টাকিয়ে ডেকুন। ফায়ার! আগুন!'

জানালা দিয়ে সবাই তাকাল নিচের দিকে।

'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! বরফ ছাড়া আর কিছুই তো নেই। আগুন আসবে কোত্থেকে বরফের রাজ্যে!'

কামালও বেরিয়ে এসেছে কন্ট্রোল কেবিন থেকে। কথাগুলো সে-ই বলল।

কুয়াশাও সেই কথা বলল, 'কই কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না বরফ ছাড়া!'

ডি. কস্টা খেঁকিয়ে উঠল, 'হাপনারা সবাই ব্লাইণ্ড হইয়া গেছেন। মাই গড! এই কানাডের লইয়া হামি এখন কি উপায় করি। ডেকিটে পাইটেছেন না! বরফের ভিটর হইটে আগুন বাহির হইয়া আসিটেছে। সাডারণ আগুনের শিখা বলিয়া মনে হইটেছে না—টেরল, লিকুইড অগ্নিশিখার মটো মনে হইটেছে···।'

সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইল সবাই ডি. কস্টার দিকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। ডি. কস্টা সবার মনোভাব বুঝতে পারল কেউ কথা বলছে না দেখে।

'হামাকে আপনারা পাগল ভাবিটেছেন। ভাবিটেছেন হামি ম্যাড হইয়া গিয়াছি! কিন্টু টাহা সট্যি নয়। পাগল এবং ব্লাইণ্ড হাপনারাই···!'

ডি. কস্টা ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। সে কি অন্ধ হয়ে গেছে?

কিন্তু ভয়টা দূর হয়ে গেল একটা কথা মনে পড়ে যেতেই।

না. সে অন্ধ হয়ে যায়নি। তার চোখে উলনের গগল্‌স্‌টা রয়েছে—কথাটা সে

ভুলেই গিয়েছিল।

চোখ থেকে গগল্‌স্‌টা এক টানে নামিয়ে আনল সে। তারপর আবার তাকাল জানালা দিয়ে নিচের দিকে। চিৎকার করে উঠল সে, 'নেই! এখন উহাকে ডেকা যাইটেছে না আর।'

আবার গগল্‌স্‌টা চোখে লাগিয়ে তাকাল ডি. কস্টা, 'আছে! এখন এগেন ডেকা যাইটেছে!'

কুয়াশার গলা শোনা গেল, 'দিন, আমাকে দিন গগল্‌স্‌টা!'

এরপর রহস্যটা আর রহস্য রইল না। নতুন এক বিস্ময়কর রহস্যের মধ্যে নিপতিত হলো ওরা।

সত্যিই আগুন! ডি. কস্টা ভুল দেখেনি।

গগল্‌স্‌টা চোখে লাগিয়ে নিচের দিকে তাকাল কুয়াশা। কয়েক মুহূর্ত পর গগল্‌স্‌টা চোখ থেকে খুলে শহীদের হাতে দিল সে। শহীদ দেখল। তারপর গগল্‌স্‌টা দিল রাসেলকে। এভাবে সবাই কিছুক্ষণ সময় নিয়ে দেখল ব্যাপারটা।

মিথ্যে বলেনি ডি. কস্টা। বরফের ভিতর থেকে দীর্ঘ, লম্বা অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। সোজা উপরে অনেক দূর উঠে এসেছে শিখাটা। অগ্নিশিখাটা সাধারণ অগ্নিশিখা নয়। যেন তরল আগুনের লম্বা একটা স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। গগল্‌স্‌ ছাড়া, খালি চোখে কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না।

'কি ওটা?' কামাল নিস্তব্ধতা ভাঙল।

কুয়াশা বলল, 'বুঝতে পারছি না। গ্যাস নয়, আমি শিওর।'

ইন্টারকমে নির্দেশ দিল কুয়াশা, 'রাজকুমারী, কামালের হাতে গগল্‌স্‌টা পাঠাচ্ছি। ওটা চোখে লাগালেই তুমি লিকুইড অগ্নিশিখা দেখতে পাবে নিচে। যতটা সম্ভব ওটার কাছাকাছি নিয়ে যাও স্পেসক্রাফটাকে।'

গগল্‌স্‌ নিয়ে চলে গেল কামাল। একটু পর সকলেই কন্ট্রোল-কেবিনে গিয়ে প্রবেশ করল। শহীদ বলল, 'গগল্‌স্‌টার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেল, তাই না, কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। উলন এইজন্যই গগল্‌স্‌টার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অগ্নিশিখাটা একটা আলোক-সঙ্কেতও হতে পারে। এ জায়গা চেনার জন্য গগল্‌স্‌টা প্রয়োজন ছিল উলনের। তবে, শহীদ, শুধু আলোক-সঙ্কেত হিসেবেই নয়, ওই অগ্নিশিখার আরও অনেক বেশি তাৎপর্য আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

কাছাকাছি থেকে আরও বিশদ জানা গেল অগ্নিশিখা সম্পর্কে। রঙটা মূলত, সোনালি। একটু যেন হলদেটে। কিন্তু আগুন হোক বা রহস্যময় আলো হোক, স্তম্ভটার ভিতর লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী আভাও রয়েছে। আলো বা অগ্নিশিখা যাই হোক, ভিজে ভিজে বলে মনে হয়। প্রায় দু'শো ফিট উচ্চতা হবে স্তম্ভটার। গোলাকার। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত হবে ওটার ব্যাস।

গগল্‌স্‌টা এখন রাজকুমারী ওমেনার চোখে। কুয়াশার নির্দেশ পেয়ে স্তম্ভটার আরও কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে স্পেসক্রাফটাকে। কিন্তু প্রতিবাদ করে

উঠল সে এক সময়, 'আর বোধহয় এগোনো উচিত হবে না।'

কুয়াশা কেবিনের দেয়ালে লটকানো সেনসিটাইজড থারমোমিটার-এর দিকে চোখ রেখে বলল, 'ভয় নেই। এগিয়ে যাও! দেখতে যাই হোক, স্তম্ভটা উত্তপ্ত নয়, বোঝা যাচ্ছে।'

'আগুন, অথচ উত্তাপ নেই!'

কামাল অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল শহীদের দিকে। শহীদ বলল, 'আগুন নয়, এখন বোঝা যাচ্ছে। আগুন হলে তাপ থাকত।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর ভারি শোনাল, 'রাজকুমারী, স্তম্ভটার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও এবার স্পেসক্রাফটাকে।'

চমকে উঠল এবার সবাই। রাজকুমারী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। কিন্তু তর্ক করল না সে। কুয়াশার নির্দেশ শিরোধার্য।

রহস্যময় স্তম্ভটার ভিতর প্রবেশ করল স্পেসক্রাফট।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। অতি ধীর গতিতে স্তম্ভের ভিতর দিকে স্পেসক্রাফট চলে গেল—কিছুই ঘটল না।

কিছু না ঘটায় ওরা সবাই যেন একটু নিরাশই হলো।

আরও নিচে নামল স্পেসক্রাফট। কুয়াশা স্তম্ভটার উৎস মুখ আবিষ্কার করতে চায়।

আরও খানিক নিচে নেমে ওরা দেখল বরফের উপর প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখা যাচ্ছে। তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে স্তম্ভটা। গহ্বরটার চারপাশে কালচে পাথর দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কোন সুড়ঙ্গের মুখ। প্রায় দশগজ প্রস্থ সুড়ঙ্গ-মুখটা কিন্তু আধ মাইলের মত চওড়া।

'রাজকুমারী, সরে যাও! কুয়াশা বলে উঠল।

'কি ব্যাপার?' সবাই একযোগে জানতে চাইল।

'ওই দেখো একটা 'কপ্টার। নিশ্চয়ই শিকদার এবং উলন।'

স্পেসক্রাফটের দায়িত্ব নিল কুয়াশা।

সবাই দেখতে পেল দূরাকাশে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত হেলিকপ্টারটাকে। এদিকেই উড়ে আসছে সেটা।

রাসেল বলে উঠল, 'সাবধান! ওরা রকেট ছুঁড়তে পারে!'

কুয়াশা বলল, 'মনে হয় না। এই স্পেসক্রাফটের ওপর লোভ আছে ওদের। এটাকে বাধ্য না হলে নষ্ট করতে চাইবে না ওরা।'

ডি. কস্টা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, 'হামাডেরকে ধ্বংস না করে স্পেসক্রাফট দখল করটে পারবে না ওরা।'

স্পেসক্রাফট নামছে। সুড়ঙ্গের আশপাশে পাথরের সমতল ভূমি, সেখানেই সরাসরি নামল সেটা।

লাফ দিয়ে নিচে, পাথরের উপর নামল সবাই। হাতির মত মোটা দেখাচ্ছে সবাইকে। গরম কাপড়ে মোড়া প্রত্যেকের দেহ। তবু নিচে নামতেই, ঠাণ্ডায় ঠক

ঠক করে কাঁপতে লাগল সবাই।

'বরফ হইয়া যাইটে পারি, টাই না?'

ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার ভয়ে সবাই অস্থির হয়ে উঠছে। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয় এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে। প্রতি মুহূর্তে অবশ হয়ে আসছে শরীর।

কুয়াশা শহীদকে নিয়ে আবার উঠল স্পেসক্রাফটের উপর। মিনিট সাতেক পর ফিরল ওরা। স্পেসক্রাফটের কয়েকটা যন্ত্রাংশ খুলে পকেটে ভরে নিয়েছে ওরা। এগুলো ছাড়া স্পেসক্রাফট অচল।

তিন

'স্থির থেকো না কেউ। নড়েচড়ে বেড়াও।'

কুয়াশা কথাগুলো বলে সুড়ঙ্গ মুখের দিকে পা বাড়াল। সবাই যে-যার ব্যাগ-ব্যাগেজ কাঁধে নিয়ে অনুসরণ করল তাকে।

সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। তাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই।

'কাপড়-চোপড় খুলে ফেলো এবার।'

সবাই কুয়াশার কাছাকাছি পৌঁছে কথাটার অর্থ বুঝতে পারল। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উত্তাপ বেরিয়ে আসছে।

সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে।

মাথার উপর চক্কর মারছে 'কপ্টারটা। বরফের উপর নামার চেষ্টা করবে ওরা, জায়গা খুঁজছে।

ডি. কস্টা তার কোটের পকেটে আশ্রয় দিয়েছে প্রিন্সকে। কথা বলে উঠল সে, 'বস্! সুড়ঙ্গের ভিটরটা না দেখিয়া এইখান হইটে ফিরিটে চাই না।'

'কপ্টার নামছে।

বরফের সমতলভূমি স্পর্শ করল 'কপ্টার। চারদিকে তীরবেগে ছড়িয়ে পড়ল বরফের ছোট ছোট অসংখ্য টুকরো।

ওদের কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে 'কপ্টারটা। লাফ দিয়ে নামল প্রথমে উলন। তারপর শিকদার। তারপর অনুচরবৃন্দ।

আক্রমণটা এল আচমকা। তৈরি ছিল না ওরা। 'কপ্টার থেকে নেমেই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসবে তা ওরা ভাবেনি। কিন্তু তাই ঘটল। স্টেনগানের বুলেট ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল ওদের দিকে।

পিছিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ধাপে নামল ওরা। পাথরের গায়ে বুলেটের বৃষ্টি পড়ছে। পাথরের টুকরো ছুটে আসছে চারদিক থেকে ওদের দিকে।

সবচেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল প্রিন্স। এখনও একেবারে বাচ্চা সে। ডি. কস্টার পকেট থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সে সিঁড়ির ধাপে। আর এক লাফ দিয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে ছুটল সে।

চেঁচিয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'ও গড! প্রিন্স!'

ছুটল ডি. কস্টাও।

কুয়াশা দ্রুত বলে উঠল, 'হল্ট! এক পাও এগোবেন না আর!'

ফাঁকা জায়গায় উঠে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ডি. কস্টা, দেখল দিশেহারার মত কয়েক গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রিন্স। এলোপাতাড়ি গুলির শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ডি. কস্টা পড়ে গেল । না, গুলি বিদ্ধ হয়নি তার শরীরে। কয়েকটা বুলেট তার মাথার হ্যাটটাকে ফুটো করে দিয়েছে মাত্র, মাথা থেকে খসে পড়েছে হ্যাটটা। এরপর ইচ্ছা করেই পড়ে গেছে ডি. কস্টা। হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে সে।

কুকুরটার কাছে যেতে হলো না। সে নিজেই লাফ দিয়ে চলে এল ডি. কস্টার কাঁধের উপর।

খপ করে এক হাত দিয়ে প্রিন্সকে ধরে ফেলল ডি: কস্টা।

নিরাপদেই ফিরে এল ডি. কস্টা প্রিন্সকে নিয়ে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির ধাপে। সবাই ভীষণ রাগারাগি করলেও কুয়াশা কিছু বলল না। সে জানে, রাগ করলে লাভ নেই। বিপদকে ভয় করতে শেখেনি ডি. কস্টা, শিখবেও না কোনদিন। যাকে ভালবাসে সে তার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছ পা হবে না কোনদিন। এটা একটা মস্ত গুণ ডি. কস্টার।

শহীদ মনোকল ম্যাগনিফাইয়ার-এর সাহায্যে পাথরের প্রকৃতি বিচার করার কাজে মগ্ন হয়ে পড়েছে সুড়ঙ্গের অকৃত্রিম সিঁড়ির ধাপে পা দেবার পর থেকে। কুয়াশা প্রশ্ন করতে ও বলল, 'কুয়াশা, এই গ্র্যানিট পাথরের গায়ে মানুষের বা মানুষ জাতীয় কোন প্রাণীর ছোঁয়া পড়েছে—প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি আমি। পাথরের প্রকৃতি বিচার করে যতদূর বুঝতে পারছি, সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ আরও থাকা সম্ভব। আমরা সম্ভবত অচিহ্নিত একটা গ্র্যানিট পাথরের আইল্যাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। উপরের বরফগুলো আচ্ছাদন মাত্র—নিচে পাথর। অর্থাৎ বরফের রাজ্যে এটা একটা পাথরের দ্বীপ। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উত্তাপ আসছে দেখে আমি মনে করি এর ভিতর প্রাণী আছে। সুড়ঙ্গটা সম্ভবত কোন পাতালপুরীতে প্রবেশ করার পথ।'

কুয়াশা মেনে নিল শহীদের বক্তব্য।

মাথা উঁচু করে শত্রুদের গতিবিধি দেখছিল কুয়াশা খানিক পরপরই। 'কপ্টারের ভিতর থেকে কয়েকটা ভারী কাঠের বাক্স বের করছে লোকগুলো, দেখতে পাচ্ছে সে। গুলিবর্ষণ বন্ধ রেখেছে তারা।

কয়েক মুহূর্ত পর কুয়াশা মাথা নামিয়ে নিল। দ্রুত বলে উঠল, 'আরও নিচে নেমে যেতে হবে আমাদেরকে! ওরা গ্রেনেড গান ব্যবহার করবে।'

কাঠের বাক্স থেকে কয়েকটা বড় আকারের ভাঁজ করা রাইফেল বের করে তাতে হ্যাণ্ড গ্রেনেড ফিট করে লক্ষ্য স্থির করছে শত্রুরা, দেখেছে কুয়াশা। খানিক পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল সুড়ঙ্গের কাছাকাছি। কেঁপে উঠল পায়ের নিচের

পাথর।

কুয়াশা হঠাৎ দুটো হাত একত্রিত করে মুখের সামনে চোঙ এর মত করে ধরল, তারপর উঁচু গলায় বলে উঠল, 'শিকদার! স্পেসক্রাফটের কিছু পার্টস আমরা সরিয়ে ফেলেছি।'

শত্রুদেরকে তথ্যটা জানিয়ে কুয়াশা শহীদের উদ্দেশে বলল, 'ওদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা পরে হবে, কি বলো? আমরা সুড়ঙ্গের ভিতরটা দেখি আগে।'

রাসেল বলল, 'শত্রু পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

কামালও বলে উঠল, 'ব্যাটাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ছটফট করছে হাত দুটো। মারামারি না করে ভিজে বেড়াল হয়ে থাকলে যে শরীরে মরচে ধরে যাবে।'

রাজকুমারী ওমেনা বলল, 'শক্তি যতটুকু আছে, জমিয়ে রেখে দাও, কামাল ভাই, বুঝলে? অলৌকিক মহাশক্তিরা যখন হামলা করবে তখন লড়তে হবে না?'

কথা বলতে বলতে সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে পাথরের সুড়ঙ্গে নেমে এল সবাই। শহীদ, কামাল এবং কুয়াশার পকেট থেকে বেরিয়ে এল টর্চ। ওদের দেখাদেখি বাকি সবাই টর্চ জ্বালল। দশ-পনেরো গজ যাবার পরই একটা বাঁক পাওয়া গেল। বাঁক পেরিয়ে ওরা দেখল সুড়ঙ্গ এরপর অস্বাভাবিক চওড়া হয়ে গেছে।

এগিয়ে চলল ওরা। শীত তো দূরের কথা, ঘামতে শুরু করেছে সবাই। সুড়ঙ্গের সিলিং এবং দেয়ালে ভেজা ভেজা চুনা পাথরের চাঁইগুলোকে হাতির দাঁতের মত দেখাচ্ছে।

প্রশস্ত সুড়ঙ্গ এক এক জায়গায় এক এক আকার নিয়েছে। লম্বা-চওড়া কামরা বলে মনে হয় এক একটাকে। কোন কোন জায়গায় ছাদ এত বেশি উঁচুতে যে টর্চের আলো সেখানে পৌঁছায় না। দু'পাশে অসংখ্য নানা আকারের অলিগলি, প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে।

কথা বলছিল ওরা। সবিস্ময়ে এক একজন এক একটা মন্তব্য করছিল। প্রতিটি কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও উচ্চকিত শব্দে ফিরে আসছিল ওদের কাছে। কথার শব্দই নয়, পদশব্দ এমন কি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ—সবই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

মিনিট চারেক এগোবার পর কুয়াশার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল চারদিক থেকে, 'দাঁড়াও!'

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। যথাসম্ভব স্থির হয়ে গেল সবাই। নিঃশ্বাসের শব্দও করছে না কেউ। অথচ প্রতিধ্বনির শব্দ থামল না।

'শুনতে পাচ্ছ, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'পাচ্ছি। আমরা ছাড়াও এই সুড়ঙ্গে আর একদল মানুষ আছে। সম্ভবত শিকদারের দল। ওরা বোধহয় শর্টকাট কোন পথ দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে।'

কুয়াশা নিচু কিন্তু দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এগিয়ে চলো!'

এগিয়ে যেতে শুরু করল ওরা। কুয়াশা শহীদের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু যেন বলল। শহীদ মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল তাকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কুয়াশা বলে উঠল, 'দাঁড়াও সবাই। সর্বনাশ! শহীদ, সামনের বাঁকের পর সুড়ঙ্গের দেয়াল। এখন উপায়? পিছনে শত্রুরা, সামনে এগোবার পথ নেই—আটকা পড়ে গেছি দেখা যাচ্ছে।'

কুয়াশার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসির আওয়াজ পাওয়া গেল পিছন থেকে শিকদারের।

বিকট অট্টহাসির প্রতিধ্বনিত শব্দে কানে তালা লাগার অবস্থা হলো। তারপরই ঠা ঠা ঠা ঠা শব্দে গর্জে উঠল একাধিক স্টেনগান।

'আলো অফ করো!' নির্দেশ দিল কুয়াশা, 'ক্রল করে এগিয়ে এসো সবাই এদিকের বাঁকে। এখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালটা আক্রমণ চালাতে হবে।'

ক্রল করে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সবাই।

ডি. কস্টা বলে উঠল, 'কিন্টু এনিমিডের সুবিডা অটিক মনে হইটেছে। উহারা হামাডেরকে ফাঁডে ফেলিয়াছে।'

কামাল বলল, 'সুড়ঙ্গ এখানে শেষ হয়ে গেছে তা সম্ভবত ওরা জানে···।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'আস্তে! আমরা আটকা পড়ে গেছি তা ওদেরকে জানানো চলবে না!'

কিন্তু শিকদার এবং তার দলবল খানিক আগেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। কুয়াশার কথা তারা শুনতে পেয়েছে পরিষ্কার। সামনের একটা প্রকাণ্ড গুহার ভিতর সে এবং তার দলবল পজিশন নিয়ে আছে।

শিকদার কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমাদের খেলা খতম হয়ে গেছে, কুয়াশা। সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার এই একটাই রাস্তা। এ রাস্তা আমরা ছাড়ছি না। ভালোয় ভালোয় সারেণ্ডার করো সবাই। তা না হলে না খেয়ে পচে মরতে হবে। তোমরা সারেণ্ডার না করলে আমরা গ্রেনেড দিয়ে সুড়ঙ্গের ছাদ আর দেয়াল ধসিয়ে দিয়ে একমাত্র বেরুবার পথটাও বন্ধ করে দেব। পচে মরবে তোমরা। চার-পাঁচ দিন পর আবার গ্রেনেডের সাহায্যে পথটা উন্মুক্ত করব। সংগ্রহ করব স্পেসক্রাফটের পার্টসগুলো। ভেবে দেখো কি করবে, দু'মিনিট সময় দিলাম তোমাদের।'

উত্তর দিল না কুয়াশা। ফিসফিস করে রাজকুমারী বলল, 'কি ভাবছ, কুয়াশা?'

ডি. কস্টা ঢোক গিলল, 'পচিয়া মরিটে ঘৃণা লাগে। হামাডের এই শরীর হইটে পচা ডুরগণ্ড বাহির হইবে—আনবিয়ারেবল্!'

কামাল অস্থির কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু সারেণ্ডার করতেও রাজি নই আমি।'

রাসেল মরিয়া হয়ে জানতে চাইল, 'আমরা কি যুদ্ধ করব না, কুয়াশাদা?'

শান্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা, 'লাভ নেই।'

'তাহলে!'

এদিকে উলনের সঙ্গে পরামর্শ করছে শিকদার। তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আলোচনা শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, গ্রেনেড মেরে একমাত্র

বেরুবার পথটা এক হপ্তার জন্য বন্ধ করেই দেবে তারা।

কুয়াশা কথা বলল, 'কিছু করার নেই আমাদের, রাসেল। গ্রেনেড ফাটুক, দেখা যাক পথটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় কিনা। ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।'

কয়েক মুহূর্ত পর প্রথম গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। কুয়াশার নির্দেশে আরও খানিকটা পিছিয়ে এল ওরা সবাই। এরপর গ্রেনেড ফাটতে লাগল একটার পর একটা। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সুড়ঙ্গের দেয়াল এবং মেঝে।

মোট চারটে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে দম আটকে এল ওদের।

কুয়াশা নির্দেশ দিল, 'সবাই এখানে থাকো। শহীদ, এসো আমার সঙ্গে।'

সামনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা দু'জন।

মিনিট তিনেক পর ফিরে এল ওরা। শহীদ বলল, 'উঠে পড়ো সবাই। শিকদাররা সত্যি বন্ধ করে দিয়েছে পথটা।'

'এখন উপায়!'

শহীদ সহাস্যে বলল, 'চলো, এগিয়ে যাই ভিতর দিকে। কুয়াশা বলেছিল বটে সুড়ঙ্গের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। কিন্তু তা সত্যি নয়। শত্রুদেরকে ভুল ধারণা দেবার জন্যে কথাটা বলেছিল ও। সামনে কোন দেয়াল নেই।'

সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কুয়াশা বলল, 'শত্রুরা জানবে আমরা আটকা পড়ে গেছি। ফলে অনেক সুবিধে পাব আমরা।'

উলনের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে শত্রুদল। সুড়ঙ্গে হাজারটা অলিগলি, অসংখ্য প্যাসেজ। কিন্তু উলন দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে সে। দেখে নিচ্ছে দেয়ালের কিছু সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

এই চিহ্নগুলো উলন অনেক আগেই রেখে গিয়েছিল দেয়ালে।

শিকদার বলল, 'ঠিক পথে যাচ্ছ তো?'

উলন বলল, 'বিশেষ করে এই সুড়ঙ্গটা খুবই জটিল। পাঁচ হাজার প্যাসেজ আছে এর ভিতর। এই জায়গাকে বলা হয় ল্যাণ্ড অব দ্য লস্ট। এখানে কেউ ঢুকে আজ অবধি বেরিয়ে যেতে পারেনি। একমাত্র আমিই সফল হয়েছি। চিহ্ন রেখে গেছি আমি। পথ হারাবার কোন ভয় একমাত্র আমারই নেই।'

এগিয়ে চলেছে দলটা। কোথায় কোন্ দিকে তা একমাত্র উলনই জানে। হাঁটার, এগিয়ে যাবার বিরাম নেই তার।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা একনাগাড়ে হাঁটার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল উলন। শিকদার এবং তার পিছনের অনুচরবৃন্দও দাঁড়িয়ে পড়ল। শিকদার ক্লান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

উলন নিচের দিকে পাথরের গায়ে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের গায়ে পায়ের ছাপ।

'সোনা! সোনার পায়ের ছাপ! কিন্তু সোনা এখানে এল কি ভাবে! কী আশ্চর্য!'

শিকদার জানতে চাইল, 'সোনা? সোনা কে?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল উলন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'সোনা, একমাত্র সোনাই রাজকীয় চিহ্ন খোদাই করা স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়। চিনতে ভুল হয়নি আমার। সোনা কে? তোমরা যাকে রাজকুমারী বলো, সোনা তাই। সে এখানকার রাজকন্যা। এই সোনাকেই আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে।'

শিকদার বলে উঠল, 'রাজকন্যা!'

উলনের মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল সে, 'সোনাকে চাই আমার। পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারছি, খানিক আগেই সে এই পথ দিয়ে গেছে। ওকে ধরতে হবে। ওকে ধরে জিম্মি হিসেবে রাখব আমরা।'

শিকদার মাথা নেড়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'বুঝেছি! রাজকুমারী সোনাকে জিম্মি রেখে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।'

উলন বলল, 'শুধু তাই নয়। সোনাকে আমরা পেলে দর কষাকষি করতে পারব এখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। আমরা যেটা নিতে এসেছি সেটা পাওয়া খুবই সহজ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে। তাছাড়া সোনাকে বিয়ে করার সাধও আমার পূরণ হবে।'

উলন ছুটতে শুরু করল। তার ধারণা, সোনা খুব বেশি দূর যায়নি এখনও। তাকে ধরা সম্ভব।

ধারণাটা মিথ্যে নয় উলনের। পনেরো মিনিট পরই সোনাকে দেখা গেল। উলনের পদশব্দ পেয়ে রাজকন্যা দৌড়ুতে শুরু করল।

কিন্তু রাজকন্যা সোনা উলনের সঙ্গে পারবে কেন? চোদ্দ কি পনেরো বছর বয়স তার। কোমর অবধি সোনালি চুল। গায়ে আঁটো পোশাক। পোশাকটা যেমন নরম তেমনি উজ্জ্বল—কিন্তু কাপড়ের নয়। রাজকুমারীর চোখে অদ্ভুত আকৃতির একটা গগল্‌স্‌ও রয়েছে।

ধরা পড়ে গেল সোনা। মূলত ইচ্ছা করেই ধরা দিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে উলনের দিকে তাকাল সে। দেখল উলনের ডান হাতটা বাতাসে ভর দিয়ে ফড়িংয়ের মত উড়ছে, অমনি দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বোঝা গেল, হাতের ফড়িংয়ের মত উড্ডয়ন এর আগেও দেখেছে সে।

উলন দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল সোনাকে। সোনা ভীতা হরিণীর মত চেয়ে রইল, কথা বলল না। তার চোখ থেকে ছোঁ মেরে গগল্‌স্‌টা কেড়ে নিল উলন। ঠিক সেই সময় ওদের কাছ থেকে বিশ হাত দূরের একটা বাঁকের মাথার নিকটবর্তী প্রশস্ত গুহা থেকে সশব্দে ছুটে এল কয়েকটা গুলি।

শিকদার এবং হাক্কার হাতের টর্চ দুটো নিভে গেল। বুলেট কারও গায়ে নয়, টর্চে লেগেছে।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল শত্রুদল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল সবাই শেলটার নেবার জন্য। শিকদার চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলির শব্দ! রিভলবারের! তার মানে শয়তান কুয়াশা আর তার দলবল বেঁচে আছে এখনও!'

চার

শিকদার এবং তার দল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেও কয়েক মুহূর্ত পরই তৈরি করে নিল নিজেদেরকে। রাইফেল, স্টেন, রিভলবার—প্রত্যেকে নিজের নিজের অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করল ওরা।

কুয়াশার নির্দেশে গুলি করছিল সুপার মেশিন পিস্তল দিয়ে রাজকুমারী ওমেনা, কামাল এবং রাসেল। শত্রুদের কাউকে লক্ষ্য করে নয়, গুলি করছিল ওরা শত্রুদের হাতের টর্চগুলো লক্ষ্য করে।

খণ্ড যুদ্ধে যোগ দেয়নি উলন। রাজকুমারী সোনার একটা হাত ধরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। সর্বশেষ টর্চটাও গুলির আঘাতে নিভে গেল। উলন শক্ত করে চেপে ধরল সোনার হাতটা। এর এক মুহূর্ত পরই সে অনুভব করল, কে যেন সবেগে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে সোনাকে। পর মুহূর্তে, হাড্ডিসার চোয়ালে আড়াই মণ ওজনের একটা প্রচণ্ড ঘুসি খেলো। ছিটকে গিয়ে পাথরের দেয়ালে পড়ল উলন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে দাঁড়াল বটে কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে সোনার সন্ধান পেল না।

শিকদার গর্জে উঠল, 'থামো! থামো সবাই!'

শিকদার হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, কুয়াশার দল গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে দিয়েছে। নির্দেশ পেয়ে থামল অনুচরেরা।

কুয়াশা ক্রল করে এগিয়ে যাচ্ছিল, শত্রুদের শেষ টর্চটা নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উলনের সামনে গিয়ে পড়ে সে। আগে থেকেই উলনের অবস্থান দেখে রেখেছিল। সোনাকে নিরাপদে সরিয়ে আনাটা জরুরী বিবেচনা করেই শত্রুদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েনি এতক্ষণ। শুধু উলনের চোয়ালে একটা ঘুসি মেরে লাফ দিয়ে সরু একটা প্যাসেজে ঢুকে গা ঢাকা দিল কুয়াশা।

প্যাসেজের ভিতর থেকেই সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দেশ দিল কুয়াশা। নির্দেশ পেয়ে শহীদ ও কামালসহ ওরা পাঁচজনই সুপার মেশিন পিস্তলের মার্সি-বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল। সেই সঙ্গে, স্বয়ং কুয়াশা আলখেল্লার পকেট থেকে পর পর কয়েকটা আগুনে বোমা বের করে ছুঁড়ে দিল শত্রুদলের তিনদিকে।

আগুনে বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। পরমুহূর্তে দেখা গেল তিন দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো শত্রুদল।

কুয়াশার নির্দেশ পেয়ে শহীদের নেতৃত্বে প্রশস্ত কামরা থেকে বেরিয়ে ক্রল করে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। ওদের সামনেও আগুন জ্বলছে। কিন্তু কুয়াশা পকেট থেকে একটা স্প্রে-মেশিন বের করে খানিকটা তরল কেমিক্যাল সেদিকে স্প্রে করে দিতেই নিভে গেল আগুন।

এগিয়ে চলল ওদের দলটা।

এদিকে পিছিয়ে যেতে যেতে শত্রুদল হঠাৎ টের পেল, পিছনে তাদের পাথরের দেয়াল, বেরুবার কোন উপায় নেই।

শহীদের দল গুলি করতে করতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ শোনা গেল কুয়াশার কণ্ঠস্বর, 'থামো!'

থামল সবাই। অটুট নিস্তব্ধতা নামল পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের সর্বত্র।

'একি ব্যাপার! শত্রুরা গেল কোথায়! কোন টু শব্দ নেই…'

কুয়াশা বলল, 'ওরা আটকা পড়ে গেছে একটা সরু প্যাসেজে। গ্যাস বোমা ফাটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছি ওদেরকে।'

কুয়াশার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দুটো টর্চ। টর্চের আলোয় সবাই দেখল কুয়াশার পাশে অপরূপ সুন্দরী একটি কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজকুমারী ওমেনা সবিস্ময়ে জানতে চাইল, 'কে ও? কোথায় পেলে ওকে?'

কুয়াশা বলল, 'উলন একে বন্দী করেছিল। কে এ, কি এর পরিচয় জানি না। কথা বলে বটে, কিন্তু ভাষাটা পৃথিবীর কোন ভাষা নয়। ওর কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না। আমার কোন কথাও বুঝতে পারছে না ও।'

কুয়াশা থামতেই ডি. কস্টার হাতের টর্চটা নিভে গেল।

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! হামার টর্চ কে ছিনাইয়া নিল, মি. কামাল!'

কামাল বলে উঠল, 'আমি? আমি কোন্ দুঃখে আপনার…কী আশ্চর্য! আমার টর্চ কেন কেড়ে নিলেন? এ কি ধরনের ঠাট্টা। মি. ডি…!'

প্রথম ডি. কস্টা, পরে কামালের হাত থেকে কে যেন টর্চ দুটো গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিভিয়ে ফেলেছে।

'বী কেয়ার ফুল, মি. কামাল। হাপনাকে সাবধান করিয়া ডিটেছি, হামার সাঠে মস্করা করিবেন না…হাউ স্ট্রেঞ্জ! হামার পকেট হইটে কে বাহির করিয়া নিল প্রিপকে?'

গোলযোগটা এইভাবেই শুরু হলো।

রাজকুমারী খেপে উঠে চিৎকার করে উঠল, 'কী আশ্চর্য! কার এমন নীচ সাহস শুনি! আমাকে চিমটি কাটছেন—আশ্চর্য!'

কুয়াশার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সোনা। কুয়াশা তার একটা হাত ধরে রেখেছিল। হঠাৎ, কে যেন সবেগে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সোনাকে কুয়াশার কাছ থেকে।

অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কুয়াশা দ্রুত ছুটোছুটি করল এদিক ওদিক। নেই সোনা! আলখেল্লার পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ছিনিয়ে নিল কেউ তার হাত থেকে।

কুয়াশা দ্রুত, বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মেশিন পিস্তল কেউ ব্যবহার করো না। নিজেরাই মারা পড়বে তাতে। আগে আলোর ব্যবস্থা করো!'

'এই—যাহ্!' শহীদের গলা শোনা গেল, 'আমার পেন্সিল টর্চটা কেড়ে নিল কে?'

কামাল চিৎকার করে জানতে চাইল, 'এসব ঘটছে কি!'

'মহাশক্তি! অলৌকিক মহাশক্তি!'

চিৎকার করে উঠল রাসেল। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে পাথরের মেঝের উপর পড়ে গেল সে।

'পিছিয়ে এসো সবাই! সবাই একত্রিত হও!'

সকলের পিছন থেকে কুয়াশার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া হলো না কারও! আশ্চর্য ধরনের নরম ভেজা ভেজা এঁটেল মাটির মত কিছু একটা ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে প্রশস্ত সুড়ঙ্গের চারদিক থেকে। অন্ধের মত হাত ছুঁড়ে, মুঠো করে ধরার চেষ্টা করছে ওরা অদৃশ্য শত্রুদের। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না। ক্রমশ চেপে বসছে নরম, ভেজা ভেজা জিনিসটা প্রত্যেকের মুখের উপর। জিনিসটা দুর্গন্ধ যুক্ত। ধরতে পারা যায় না।

অসহায়ের মত ছুটোছুটি করতে লাগল ওরা। মুখে, গলায়, বুকে, হাতে, কোমরে—শরীরের সর্বত্র সেই বিচিত্র অচেনা নরম জিনিসগুলো চেপে বসছে। আতঙ্কে, ভয়ে সবাই দিশেহারা হয়ে পড়ল।

দুর্গন্ধটা চেনা চেনা, কিন্তু চিনতে পারল না কেউ। একের পর এক, সবাই পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল। নিঃসাড়, মৃতবৎ পড়ে রইল সবাই।

একমাত্র কুয়াশা তখনও পরাজয় স্বীকার করেনি। দম বন্ধ করে সংগ্রাম করে চলেছে সে। বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি করছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু। তবু, অদৃশ্য শত্রুদের ধরার জন্য চেষ্টার বিরাম নেই তার।

কিন্তু দম বন্ধ করে কতক্ষণ থাকতে পারে একজন মানুষ! শেষ পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ করতে হলো তাকে।

আর সবার মত, কুয়াশার প্রকাণ্ড দেহটা সশব্দে পড়ে গেল পাথরের মেঝেতে।

অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল রহস্যময় পাতালপুরীতে।

পাঁচ

জ্ঞান ফিরে পেয়েও ওরা চারদিকে গাঢ় এবং নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। মেঝেটা মনে হলো অপেক্ষাকৃত সমতল। কুয়াশা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে প্রশ্ন করে জেনে নিল কার অবস্থা কেমন। আঘাত পেয়েছে এক-আধটু সবাই। তবে কারও আঘাতই মারাত্মক ধরনের নয়। সবার পকেটগুলো শূন্য—আবিষ্কার করল ওরা। কিন্তু আশ্চর্য বোধ করল এই দেখে যে—কারও হাত-পা-ই বাঁধা হয়নি।

কামালের প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা বলল, 'অলৌকিক মহাশক্তিই হোক বা আর

যেই হোক, যারা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তারা হয়তো জানে পালাবার কোন উপায় নেই আমাদের, তাই হয়তো বাঁধার প্রয়োজন বোধ করেনি।'

'মাই গড! হামার প্রিন্স কোঠায়!'

কুকুরটা ডি. কস্টার কণ্ঠস্বর চেনে। কার যেন পদশব্দ শোনা গেল। ডি. কস্টা অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল, ধরে ফেলল প্রিন্সকে। কামাল বলে উঠল, 'আল্লাই জানে শিকদারের দলের ভাগ্যে কি ঘটেছে! কুয়াশা, আমরা এখন কোথায় বলতে পারো?'

'যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আরও নিচে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে। টেমপারেচার অনুভব করে বুঝতে পারছি। এই মুহূর্তে আমরা একটা বড়সড় কামরার মত জায়গায় রয়েছি।'

ডি. কস্টা খেপে উঠে বলল, 'বী কেয়ারফুল। আর একবার যডি আমার মাঠায় গাঁট্টা মারো···।'

'কে গাঁট্টা মারল তোমার মাথায়!' জানতে চাইল রাজকুমারী ওমেনা।

'এই···! হোয়াট ইজ দিস। হামার প্রিন্সকে কে···। মাই গড! এগেন সেই ভৌটিক কাণ্ড···।'

প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেলো কুয়াশা ঠিক কপালের পাশে, ডান কানের উপরে। মাথাটা ঘুরে উঠল তার! 'আরে। আমার চুল ধরে টানছে কে····।'

কামাল তার মাথার পিছন দিকে ঘুসি চালাল। কিন্তু ঘুসিটা বাতাসেই লাগল।

এরপর ওরা একযোগে আক্রান্ত হলো। সব দিক থেকে ওদের কাপড়-চোপড় ধরে টানাটানি করতে লাগল কারা যেন। সেই সঙ্গে চারদিক থেকে হাতুড়ির বাড়ির মত ঘুসি এসে পড়তে লাগল চোখে-মুখে-নাকে। রহস্যময়, বিচিত্র ধরনের শব্দ শুনতে পেল ওরা। ফিসফিসে, দুর্বোধ্য আওয়াজ। একবার মনে হলো, কারা যেন চাপা স্বরে হাসছে। একবার মনে হলো শিস দিচ্ছে। একবার মনে হলো পাখিদের কলরব চারদিকে—সবই দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার অতীত রহস্য।

'কুয়াশা!' রাজকুমারীর আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর।

অজানা ভয়ে সবাই ভীত।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো সবাই।' কুয়াশার কণ্ঠস্বর কানে ঢুকতে সবাই এই অলৌকিক বিপদে একটু স্বস্তি পেল।

রাসেল কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'কি এগুলো—এরা দেখতে কেমন? কি দিয়ে তৈরি এদের শরীর। কুয়াশাদা, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। বাতাসের মত—হাত ঢুকে যাচ্ছে জিনিসগুলোর ভিতরে অথচ অনুভব করা যাচ্ছে না।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'সম্ভবত তা নয় ব্যাপারটা। আমরা এমন একধরনের প্রাণীর সঙ্গে মোকাবিলা করছি যাদের পেশী অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে, বিদ্যুৎবেগে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আমাদের কল্পনার চেয়েও দ্রুত বেগে সরে যেতে পারে এরা। ফলে আমাদের স্পর্শ করার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু অন্ধকারে আমাদেরকে দেখছে কিভাবে ওরা?'

'সেটাই হলো রহস্য!'

কুয়াশা সর্বক্ষণ জায়গা বদল করে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একমুহূর্ত পর সকলের পিছন থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর, 'পিছিয়ে এসো সবাই। এদিকে একটা সরু প্যাসেজ রয়েছে।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে পিছিয়ে যেতে শুরু করল সবাই।

প্রচণ্ড ঘুসি খেতে খেতে রক্তাক্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। বারবার ছিটকে পড়ছে ওরা ঘুসি খেয়ে। বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। অবশেষে কুয়াশার কাছে, সরু প্যাসেজে একত্রিত হতে সমর্থ হলো ওরা সবাই।

'মন দিয়ে শোনো সবাই।' কুয়াশা পরিষ্কার গলায় বলতে শুরু করল, 'কেউ কোন অবস্থাতেই ঘাবড়ে যেয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখার উপর নির্ভর করছে আমাদের জীবন-মৃত্যু। এ-জাতীয় বিপদে এর আগে আমরা পড়িনি। এবার কি করতে হবে শোনো। পাশাপাশি, গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াও সবাই। পরস্পরের হাত ধরো। প্যাসেজটা সরু। একটা দেয়ালের মত হয়ে যাও সবাই মিলে। তারপর ধীরে ধীরে সামনে এগোও। সাবধান, কোন ভাবেই যেন তোমাদের শরীরের পাশ দিয়ে তোমাদের পিছনে কেউ যেতে না পারে, একটা পিঁপড়েও নয়।'

অশরীরী আক্রমণ বন্ধ হয়েছে এইমাত্র। দ্রুত কুয়াশার কথা মত পরস্পরের হাত ধরে পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা একটা পাঁচিলের মত। তারপর এগোতে লাগল ওরা এক পা এক পা করে সামনের দিকে।

'এগোও, এগোতে থাকো। হাত ছোঁড়ো সবাই মুঠো পাকিয়ে! সম্ভব হলে, সামনে যা পাও ধরবার চেষ্টা করো...'

কুয়াশার নির্দেশ মত কাজ করতে লাগল ওরা।

থ্যাত্ করে শব্দ হলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অশরীরী নয়—এদের শরীর আছে। এইমাত্র আমার ঘুসি লেগেছে একটার গায়ে...'

থ্যাত্! থ্যাত্! পরপর শব্দ হলো দুটো। রাসেল এবং কামালের দুটো ঘুসি লেগেছে...।

'ধরেছি। আমি ধরে ফেলেছি একটাকে।' কামাল উল্লাসে ফেটে পড়ল।

কুয়াশা বলে উঠল, 'সাবধান, ছেড়ো না, কামাল। পারবে একা সামলাতে?'

'পারব, অ্যাঁ! কুয়াশা, কামড় দিচ্ছে হাতে...। ধুত্তোরী ছাই—এটা যে মি. ডি. কস্টার প্রিন্স।'

কুয়াশা বলল, 'সাবধান, লাইন ভেঙো না কেউ। আমরা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।'

প্যাসেজও শেষ হয়ে এসেছে, অদৃশ্য শত্রুদের আক্রমণও সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে। বুকে, পেটে, মাথায় ঘুসির পর ঘুসি খাচ্ছে ওরা। কিন্তু লাইন ভেঙে কেউ পিছিয়ে পড়ছে না। সর্বশক্তি ব্যয় করে অটল হয়ে আছে প্রত্যেকে। হঠাৎ শত্রুদের আর

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

'দরজা!'

কুয়াশার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কী আশ্চর্য! বুঝলে, শহীদ, দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে ওরা।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'দরজা—কিন্তু এখানে কাঠ পেল কোথায় ওরা?'

'কাঠ নয়। অপরিচিত, কৃত্রিম কোন জিনিস দিয়ে তৈরি করেছে ওরা দরজাটা। এগিয়ে এসো, ভাঙতে হবে দরজা।'

দরজাটা ভাঙতে বিশেষ সময় লাগল না ওদের। দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল ওরা। অদৃশ্য শত্রুরা কি ভেবে, কে জানে, নতুন করে আক্রমণ চালাচ্ছে না আর। নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট সিঁড়ির ধাপ অনুভব করল ওরা। নিচে নামল। যেন একটা কামরায় প্রবেশ করল। কামরার ভিতর উঁচু নিচু নানারকম জিনিস স্পর্শ করে ওরা বুঝতে পারল এগুলো নানা ধরনের ফার্নিচার। কিন্তু ফার্নিচারগুলো অস্বাভাবিক হালকা।

'একটা গন্ধ পাচ্ছ? চিনতে পারো গন্ধটা?'

কুয়াশার প্রশ্নের উত্তর দিল শহীদ, 'পারছি। ব্যাঙের ছাতা!'

'হ্যাঁ। ব্যাঙের ছাতা। কিন্তু এখানকার ব্যাঙের ছাতাগুলো অন্য জাতের। অস্বাভাবিক বড় এবং নতুন জাতের। আমার ধারণা, বুঝলে, শহীদ, এই ব্যাঙের ছাতাকে রূপান্তরিত করে তৈরি করা হয়েছে দরজা, ফার্নিচার ইত্যাদি।'

সামনে এগিয়ে চলেছে ওরা একটু একটু করে।

'এদিকে আর একটা দরজা···।'

প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেলো কুয়াশা। পরমুহূর্তে বাকি সবাই আক্রান্ত হলো একসঙ্গে।

নরম, আঠাল, ভিজে ভিজে কিছু একটা ওদের প্রত্যেকের চোখে মুখে-নাকে এসে লাগল। চেপে বসছে সেগুলো। গন্ধটা অসহ্য···।

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দম বন্ধ করে থাকো সবাই, যতক্ষণ পারো···।'

কুয়াশা আর একটা ঘুসি খেলো ডান দিকের চোয়ালে। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে লাফ দিল সে। কিছু একটা ধরে ফেলল সে, কিন্তু জিনিসটা কি তা সে প্রথমে বুঝতে পারল না। একমুহূর্ত পর, টের পেল ব্যাপারটা। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটা গগল্‌স্‌!

গগল্‌স্‌টা চোখে পরল কুয়াশা।

তীব্র, অত্যুজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল কুয়াশার। আলোটা সয়ে এল খানিক পর। তীব্র সোনালি আলোয় সে দেখতে পেল, তার বন্ধু-বান্ধবরা কাদের বিরুদ্ধে প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে। ব্যাঙের ছাতা! এক একটা মানুষ সমান উঁচু।

সম্পূর্ণ অন্ধকারে, কয়লাখনিতে এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা জন্মায়, জানা আছে কুয়াশার। সেই জাতীয়, কিন্তু অনেক বেশি বড় এবং অদ্ভুত আকৃতির এখানকার

ব্যাঙের ছাতাগুলো।

শহীদ, কামাল—ওদের পাঁচজনকেই দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। তীব্র সোনালি আলোয় ওদেরকে কালো, অস্পষ্ট মূর্তির মত দেখাচ্ছে। ওরা সবাই প্রকাণ্ড আকারের ব্যাঙের ছাতার বিরুদ্ধে লড়ছে।

পা বাড়াল কুয়াশা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। মানুষ সমান ব্যাঙের ছাতাগুলো নড়ে উঠল, সেগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একের পর এক, অসংখ্য কালো মূর্তি।

এরাই অলৌকিক সেই শক্তি!

এগুলো মানুষের সমানই লম্বা। তাদের কারও কারও হাতে লম্বা ছড়ি দেখা যাচ্ছে। ছড়ির মাথাগুলো সাঁড়াশির মত। সেই সাঁড়াশিতে আটকে রয়েছে ব্যাঙের ছাতার ভগ্নাংশ! ছড়ির মাথার সাঁড়াশি দিয়ে ধরে ব্যাঙের ছাতা চেপে ধরছিল কুয়াশাদের মুখ, নাক, গলায়।

চারদিক থেকে লাফিয়ে পড়ল অলৌকিক শক্তিগুলো কুয়াশার উপর। আড়াই মণ ওজনের ঘুসি চালাতে শুরু করল সে। কিন্তু ওরা একটা দুটো নয়, অসংখ্য। দেখা গেল কুয়াশাকে ধরে টানা-হেঁচড়া করছে।

পড়ে গেল কুয়াশা। মৃত পোকার উপর যেমন পিঁপড়ের দল চড়াও হয় তেমনি তার শরীরের উপর চেপে বসল ওরা।

ছয়

কুয়াশা একা নয়, আক্রান্ত হলো ওরা সবাই।

মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা। পরমুহূর্তে সবাই অনুভব করল, অলৌকিক সেই শক্তিগুলো ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছে।

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কেউ। একমাত্র কুয়াশা ছাড়া। আবার সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পরমুহূর্তে সবাই অনুভব করল ওদের চোখের উপর কি যেন এঁটে বসেছে।

তীব্র, অত্যুজ্জ্বল সোনালি আলো ঝলসে উঠল প্রত্যেকের চোখের সামনে। কয়েক সেকেণ্ড পর ব্যাপারটা টের পেল ওরা, কারা যেন ওদের চোখে পরিয়ে দিয়েছে একটা করে গগল্‌স্‌।

এবার পরিষ্কার দেখা গেল ওদেরকে। ওদের প্রত্যেকের চোখে একটা করে গগল্‌স্‌ রয়েছে। প্রথমে কালো বলে মনে হলেও তাদের চেহারা খানিক পর অন্য রকম হয়ে উঠল। তীব্র আলো চোখে সয়ে আসছে, সেই সঙ্গে সব জিনিসেরই আসল রঙ দেখতে পাচ্ছে ওরা।

আশ্চর্য জীবগুলো মোটেই কালো নয়। তাদের রঙ লালচে। এবং তারা হুবহু মানুষের মতই দেখতে।

কুয়াশার গলা শোনা গেল, 'সবাই নিজেদের পিছন দিকে তাকাও।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। একদল মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অপরূপ সুন্দরী কিশোরী মেয়ে।

মেয়েটি আর কেউ নয়, রাজকন্যা সোনা। হাসছে সে। বন্ধুত্বের হাসি।

কুয়াশা বলে উঠল, 'আলো নেই, অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা, তাই না? বাতাসের সঙ্গে যে ধূলিকণা থাকে সেই ধূলিকণাকে কি পদ্ধতিতে ঠিক জানি না, উজ্জ্বল করার বৈজ্ঞানিক কৌশল আয়ত্ত করেছে এরা।'

রাজকন্যা সোনা এগিয়ে এসে কুয়াশার একটা হাত ধরল। ইঙ্গিতে সে কুয়াশাকে এবং অন্যান্যদেরকে অনুরোধ করল অনুসরণ করার জন্য।

সোনার পিছু পিছু এগোল ওরা। গগল্‌স্‌ পরা লোকেরা একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল ওদেরকে। সকলেরই গায়ের রঙ লালচে, তবে কিছু লোকের হাত ধবধবে সাদা। দরজা পেরিয়ে একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। হঠাৎ দু'জন লোককে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা দলটা।

লোক দু'জন দ্রুত এগিয়ে আসছে, তাদের হাত দুটো সাদা। দু'জনেরই ডান হাত বাতাসে ভর দিয়ে ফড়িংয়ের মত উড়ছে।

সোনা তীব্র কণ্ঠে কিছু বলতেই লোক দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের ডান হাতও সেই সঙ্গে স্থির হয়ে গেল।

'রহস্যটা বুঝলে?' রাজকুমারী জানতে চাইল।

কামাল বলল, 'উলনকে এই রকম করতে দেখেছি!'

কুয়াশা বলল, 'উলনের পরিচয় পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। এই পাতালপুরীরই একজন সে। কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে কেন সে গিয়েছিল, শিকদারকে সঙ্গে নিয়ে আবার কেনই বা ফিরে আসল তা এখনও জানা যাচ্ছে না।'

একটার পর একটা দরজা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা পাতালপুরীর অভ্যন্তর ভাগে। প্রতিটি দরজার সামনে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা।

একসময় কুয়াশা মন্তব্য করল, 'ব্যাঙের ছাতা এবং শ্যাওলা—এ দুটো জিনিস এদের কাছে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রথম যেখানে ধরা পড়ি সেখানে এই দুই জিনিসের চাষ হয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তাই ওখানে পাহারার ব্যবস্থা। পাহারাদারদের হাতেই আমরা প্রথম আক্রান্ত হই।'

প্রকাণ্ড একটা হলরুমে ঢুকল সোনা। পিছন পিছন ঢুকল কুয়াশা এবং অন্যান্যরা। রুমের ভিতর লম্বা ডিভান রয়েছে, রয়েছে চেয়ার, পালঙ্ক—নানারকম সব ফার্নিচার। সবগুলোই হালকা কিন্তু ভারি মজবুত। সোনার ইঙ্গিত পেয়ে ডিভানে বসল ওরা। সোনা সহাস্যে কথা বলল একজন লোকের সঙ্গে। লোকটা দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। মিনিট তিনেক পর আরও দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল লোকটা। তিনজনেরই হাতে খাবার ট্রে।

পাঁচ ছয় রকমের অচেনা খাদ্য। পাঁচটারই পাঁচ রকম রঙ।

খেতে কেমন স্বাদ কে জানে। ভয়ে ভয়ে মুখে দিল ওরা। খানিক পর দেখা গেল গ্রোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে সবাই।

'কী অবাক কাণ্ড। এসব খাবারের নাম কি? কি দিয়ে তৈরি? এমন স্বাদ বাইরের দুনিয়ার কোন খাবারে পাইনি···!'

কামালকে সমর্থন করল সবাই একবাক্যে।

খাওয়া শেষ হতে কুয়াশা বলল, 'আমরা কি খেলাম জানো?'

'কি?'

'খেলাম পাঁচটা নয়, একটাই জিনিস। একঘেয়েমি কাটিয়ে বৈচিত্র্য আনার জন্য এরা একই খাবারের মধ্যে বিভিন্ন রঙ এবং বিভিন্ন সুগন্ধ ব্যবহার করে। আমরা আসলে খেলাম রান্না করা ব্যাঙের ছাতা।'

'হোয়াট!'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্য ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে শ্যাওলাও মেশানো আছে।'

শহীদ জানতে চাইল, 'কিন্তু শুধু ব্যাঙের ছাতা আর শ্যাওলা খেয়ে ওরা বেঁচে আছে কিভাবে?'

কুয়াশা বলল, 'সম্ভবত ব্যাঙের ছাতা ছাড়াও অন্য কিছুর চাষ করে এরা। তবে তাও ওই ছাতা জাতীয় কিছুই হবে। ব্যাঙের ছাতা এবং শ্যাওলা থেকে কেমিক্যাল নিয়ে, প্রাকৃতিক কেমিক্যাল মিশিয়ে সার তৈরি করা হয়—সেই বিশেষ সারের সাহায্যে ব্যাঙের ছাতা চাষ করা হয়। এদের দৈহিক শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যাঙের ছাতা এবং এই অন্ধকারময় পাতালপুরীতে আর যে সব জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোকে এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের জীবন ধারণের জন্য উন্নত উপকরণে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য এ সবই আমার অনুমান।'

রাজকুমারী বলল, 'বাতাসেও কেমন একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—এটার কি ব্যাখ্যা?'

'এখানকার বাতাস জীবাণুমুক্ত। এরা সম্ভবত নদীর পানি থেকে অক্সিজেন তৈরি করে। অক্সিজেন বা বাতাস তৈরি করার কারখানা থাকা খুবই সম্ভব।'

শহীদ বলল, 'একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কোন কোন শাখায় এরা বাইরের দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। আমরা যে-সব সমস্যা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করছি সমাধান বের করার জন্য, এরা সে-সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে বহু বছর আগে।'

সোনা আবার এগিয়ে এসে কুয়াশার হাত ধরল। সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড হলরুমের অপর দরজার দিকে এগিয়ে চলল সবাই।

বাইরে বেরিয়ে অবাক বিস্ময়ে সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। কুয়াশার চোখেও মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটল। সামনে দীর্ঘ একটা মাঠ। মাঠের পর সুউচ্চ অট্টালিকা। একটা নয়, পাশাপাশি অনেকগুলো। সোনালি আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আশ্চর্য এক স্বর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা। অট্টালিকাগুলো অত্যাধুনিক আর্কিটেকচারের সাক্ষ্য বহন করছে। দেয়াল এবং পাঁচিলগুলো মসৃণ এবং কয়েক মানুষ সমান উঁচু। অট্টালিকার স্ট্রাকচার, দেয়াল, পাঁচিল, কার্নিস, জানালা, দরজা, ভেন্টিলেটার—সব কিছুই এমন নিখুঁত, এমন জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে তাজ্জব

না হয়ে উপায় নেই।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র রাসেল বলে উঠল, 'ওয়াণ্ডারফুল! ফাংশন্যাল আর্কিটেকচারের এমন উন্নত দৃষ্টান্ত কল্পনাও করতে পারি না।'

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওরা সবাই মৃদু অস্পষ্ট একটা টিক টিক শব্দ শুনতে পেল। ঘড়ির ভিতর থেকে এই ধরনের শব্দ বেরিয়ে আসে। এখানকার শব্দটা অবশ্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অবিরাম শোনা যাচ্ছে—টিক, টিক, টিক, টিক···।

অট্টালিকাগুলো পাঁচতলা সমান উঁচু। কোন কোনটা আরও বেশি।

শহীদ আঙুল দিয়ে দূরবর্তী একটা অট্টালিকা দেখাল। এটার গায়ে অনেক বেশি জানালা। পিলারের উপর দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ অট্টালিকা। নিচে খরস্রোতা নদী। গায়ে মাছের ছবি আঁকা রয়েছে।

কুয়াশা বলল, 'ওটা একটা কারখানা বলে মনে হচ্ছে। ওখানে সম্ভবত নদীর মাছকে ড্রাই-ফুডে রূপান্তরিত করা হয়।'

'ডান দিকের ওই বিল্ডিংটা—আরে, ওটার দেয়ালে আঁকা রয়েছে ব্যাঙের ছাতা।'

রাজকুমারী থামতে কুয়াশা বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? পাশাপাশি এতগুলো বড় বড় ফ্যাক্টরী রয়েছে অথচ ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, দুর্গন্ধ নেই। কোথাও কোন আবর্জনাও চোখে পড়ছে না। এসবের অর্থ হলো, এখানকার মানুষরা সব জিনিসকেই কাজে লাগাতে পারে। এদের কাছে কোনটাই অকাজের নয়।'

মাঠের উপর নামল ওরা। চারদিক থেকে কালো গগল্‌স্ পরিহিত লোকজন এগিয়ে এল। ওদেরকে কেন্দ্র করে বড়সড় একটা ভিড় জমে উঠল দেখতে দেখতে। এগিয়ে চলল ওরা সামনের দিকে।

ভবনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় ওদেরকে নিয়ে সেটার দিকে এগোচ্ছে সোনা। ভবনটার কাছাকাছি পৌঁছে কয়েকটা জিনিস লক্ষ করল ওরা। ভবনটার চেহারা দেখে মনে হলো, পাতালপুরীর অধিবাসীদের জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় জরুরী জিনিসের সরবরাহ এখান থেকেই বুঝি হয়। ভবনটার যত কাছাকাছি যাচ্ছিল ওরা সেই ছন্দবদ্ধ টিক টিক শব্দটা ততই উচ্চকিত হয়ে উঠছিল। এদিকের বাতাস অপেক্ষাকৃত তাজা। ভবনটা অনেকটা গোলাকার। মাথার উপর মোটা মোটা পাইপ, এরিয়াল ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

'এটা সম্ভবত সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্ট। টিক টিক শব্দটা এর ভিতর থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। খনিজ পদার্থ অর্থাৎ লোহা ইত্যাদির ব্যবহারও তাহলে জানে এরা।' কুয়াশা বলল।

আরও কাছাকাছি যেতে মৃদু, অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পেল ওরা। ধ্বনিটা বেরিয়ে আসছে কুয়াশার দেয়া নাম সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের ভিতর থেকেই।

শহীদ হঠাৎ বলে উঠল, 'ও কিসের শব্দ!'

কুয়াশাও থমকে দাঁড়িয়েছে, 'মেশিনগানের শব্দ। মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল

মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের পিছন দিক থেকে গুলির শব্দ হচ্ছে। এখানকার মানুষের আগ্নেয়াস্ত্র নেই—তারমানে শিকদার আর উলনের দল!'

সাত

মেশিনগানের শব্দ শুনেই শিকদার এবং উলনের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরেছে কুয়াশা। সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্ট—পাতালপুরীর অধিবাসীদের প্রধান শক্তির উৎস এটা। শত্রুরা এটা দখল করতে চাইছে।

রাজকুমারী সোনাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে বলে উপস্থিত পাতালপুরীর লোকদের অনুরোধ করল কুয়াশা সোনাকে যেন তারা একা ছেড়ে না দেয়। ভাষা দিয়ে নয়, ইশারায়-ইঙ্গিতে কাজ সারল সে।

দল সঙ্গে নিয়ে ছুটল এরপর কুয়াশা। যাবার পথে একটা সুদৃশ্য বাগান চোখে পড়ল। কুয়াশার নির্দেশে বাগানে প্রবেশ করল সবাই। ব্যাঙের ছাতার একটা করে কাণ্ড হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল সবাই। ভেঙে সুপারমেশিন পিস্তলের সাইজ করে নিল ওরা কাণ্ডগুলোকে। কুয়াশা বলল, 'তীব্র সোনালি আলোয় ভাল দেখা যায় না, অভ্যাস না থাকলে। শত্রুরা এগুলোকেই পিস্তল বলে মনে করবে।'

এদিকে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের পিছনের গেটে রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছে। শিকদার এবং তার দলবল গেটের বারোজন প্রহরীকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের চোখ থেকে খুলে নিয়েছে গগল্‌স্‌গুলো। গগল্‌স্‌ পরে তারা উজ্জ্বল আলোয় হঠাৎ দেখল, দূর থেকে ছুটে আসছে কুয়াশার দল। দিশেহারা হয়ে পড়ল শিকদার। মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের গেট বন্ধ। গেটটা ভাঙাও সম্ভব নয়। প্রচুর সময় লাগবে। এদিকে নাছোড়বান্দা কুয়াশার দল ছুটে আসছে। তাদের হাতে সুপারমেশিন পিস্তলও দেখতে পাচ্ছে সে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল শিকদার। দলবল নিয়ে পিছিয়ে গেল সে। কাছাকাছি একটা আবাসিক ভবনের সামনে গিয়ে চিন্তা করতে লাগল পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়া যেতে পারে। কুয়াশাকে সে ভয় করে যমের মত। তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করাটাই সবচেয়ে জরুরী। শিকদার সিদ্ধান্ত নিল, পাশের ভবনটার ছাদে উঠে যাবে তারা।

দুই মিনিট পরই দেখা গেল শিকদার আর তার দল পাঁচতলা সমান উঁচু একটা ভবনের ছাদে উঠে গেছে। সেখান থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করছে তারা নিচের দিকে।

ইতিমধ্যে মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে কুয়াশার দল। নিহত লোকগুলোকে দেখে দাঁতে দাঁত চাপল কুয়াশা। বলল, 'শহীদ, তুমি সবাইকে নিয়ে প্ল্যান্টের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করো। ভিতরের লোকদের বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়ে একত্রিত হতে বলো সবাইকে।'

'তুমি কি করবে?'

কুয়াশা বলল, 'আমি শিকদারের সন্ধানে যাচ্ছি। মেশিনগানের গুলি বন্ধ

করতেই হবে। এখানকার মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়, সবাই কেমন দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে। আমি চললাম। খুনী শিকদারকে কঠোর শাস্তি না দিয়ে শান্তি পাচ্ছি না আমি।'

কথাগুলো বলে যে-পথে এসেছিল সেই পথে ছুটতে শুরু করল কুয়াশা। খানিক পরই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্ল্যান্টের ছাদ থেকে কালো টুপি পরা একজন লোক শহীদদেরকে রাজকুমারী সোনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল খানিক আগে। গেটের সামনে ওদেরকে দেখে লোকটা ধরে নিল, এরা শত্রু নয়, মিত্র। তার চিৎকারে গেটের ভিতরে দাঁড়ানো প্রহরীরা গেট খুলে দিল। একে একে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের ভিতর প্রবেশ করল ওরা। সবার শেষে ভিতরে ঢোকার জন্য পা বাড়াল কামাল। হঠাৎ সে একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। দেখল, একজন লোক চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে গেটের দিকে। লোকটার মাথায় কালো টুপি রয়েছে। লোকটাকে চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারল না কামাল। গেটের ভিতর ঢুকল সে। গেট বন্ধ করে দিল প্রহরীরা।

প্রকাণ্ড উঠানের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদেরকে দেখে চারদিক থেকে লোকজন এগিয়ে আসছে।

গেটের বাইরে থেকে ভেসে আসছে সেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ কামাল থমকে দাঁড়াল। চিৎকার করছে দুর্বোধ্য ভাষায়—কে ও? চেনা চেনা মনে হলো। হঠাৎ চেহারাটা চিনতে পারল সে। উলন।

'উলন চিৎকার করছে।'

শহীদ বলল, 'সাবধান!'

সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। চারদিক থেকে যারা ওদেরকে দেখার জন্য এগিয়ে আসছিল তাদের মুখে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল হাসি হাসি ভাব। কিন্তু উলনের চিৎকার শুনে তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

লোকগুলো ঘিরে ফেলল ওদেরকে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে শহীদের দল। আতঙ্কিত, বিস্ফারিত চোখে ওরা দেখল চারদিক থেকে লোকগুলো ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত। যারা এগিয়ে আসছে তাদের প্রত্যেকের হাত ধবধবে সাদা। প্রত্যেকের ডান হাত বাতাসে ভর দিয়ে ফড়িংয়ের মত রয়ে সয়ে উড়ছে।

ঘোরা পথ ধরে ভবনটার নিচে এসে দাঁড়াল কুয়াশা। এই ভবনের ছাদেই আশ্রয় নিয়েছে শিকদারের দল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু সেটা নিরাপদ হবে না ভেবে কুয়াশা সিদ্ধান্ত নিল অসংখ্য সরু সরু যে পাইপগুলো ভবনের দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে সেগুলো ধরেই উঠে যাবার চেষ্টা করবে সে।

বৃষ্টি এবং রোদের অস্তিত্ব নেই বলে জানালাগুলোর কবাট নেই। তবে পর্দা আছে। প্রতিটি জানালায় প্রবেশ করেছে একাধিক সরু পাইপ। পাইপগুলোও দেয়ালের মত সোনালি রঙের বলে দূর থেকে দেখা যায় না। যাই হোক, সরু পাইপ ধরে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। দ্রুত উঠছিল সে। পাইপগুলো সরু এবং রাবারের মত নরম হলেও, বেশ মজবুত। ছিঁড়বার ভয় নেই।

চারতলা অবধি উঠে গেল কুয়াশা। এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। একটা জানালার পাশ ঘেঁষে উঠছিল কুয়াশা। এক মহিলা কামরার ভিতর থেকে কুয়াশাকে দেখতে পেয়েই আর্তচিৎকার করে উঠল।

মহিলার দুর্বোধ্য চিৎকার কানে গেল শিকদার আর তার দলের লোকদের। ছাদের কিনারায় বসে ছিল আমীর খান তার স্টেনগান বাগিয়ে ধরে। উঁকি মেরে নিচের দিকে তাকাল সে। তাকিয়েই দেখতে পেল কুয়াশাকে। দ্রুত উঠে আসছে কুয়াশা উপর দিকে।

'শয়তান কুয়াশা নিজেই মরতে এসেছে।' ফিসফিস করে বলে উঠল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে সোনালি আলো নিভে গেল।

শিকদার বলল, 'কি হলো! গগল্‌স্‌টা কি খারাপ হয়ে গেল আমার?'

সবাই একসাথে বলে উঠল, 'না। আমরাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

শিকদার বলল, 'বড় কারখানাটায় গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়ই। ওখান থেকেই শীতল আলো সরবরাহ করা হয়…।'

শিকদারের কথা চাপা পড়ে গেল আমীর খানের স্টেনগানের বিকট শব্দে। অন্ধকারেও সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করেনি সে। কুয়াশা মাত্র হাত দশেক নিচে ছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য আমির খানের। এত কাছ থেকে তার লক্ষ্য ব্যর্থ হবার নয়।

স্টেনগানের শব্দ থামল। কান পেতে রইল আমীর খান। নিচে দেহটা পড়বে কুয়াশার, নিশ্চয়ই শব্দ শোনা যাবে।

শোনা গেল শব্দ। অস্পষ্ট হলেও শব্দটা শুনে আমীর খান বুঝতে পারল কুয়াশার মৃতদেহ নিচের রাস্তায় পড়ে গেছে।

চিৎকার করে উঠল সে, 'কুয়াশা নেই! কুয়াশাকে খতম করে ফেলেছি!'

'কি! কি বলছ তুমি?' শিকদার চমকে উঠল।

সব কথা ব্যাখ্যা করে বলল আমীর খান। শিকদার সব শুনে প্রথমে কথাই বলতে পারল না। উত্তেজিত বোধ করছিল সে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা বোধ করছিল। নিস্তব্ধতা ভেঙে ডাকল সে, 'আমীর!'

আমীর খান সাড়া দিল না।

'আমীর খান?'

শিকদার ডাকল। তবু সাড়া নেই আমীর খানের। কথা বলে উঠল হাক্কা, 'আরে, আমীর খান আমার পাশে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে যে…।'

ভোমর হঠাৎ বলে উঠল, 'কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে কি সব যেন ছুটে যাচ্ছে।'

হাক্কা বলল, 'আমীর খানের ঘাড়ে কি যেন বিঁধে রয়েছে একটা। টেনে বের করতে পারছি না…।'

শিকদার কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো! এখানকার পুলিসবাহিনী বিষাক্ত তীর ছুঁড়ছে…।'

হাক্কা চিৎকার করে উঠল, 'ফজলা! ফজলা! সর্দার, ফজলা আমার পাশে ছিল, পড়ে গেছে ও, নড়ছে না…।'

'শুয়ো পড়ো!'

দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল শিকদার, 'দু-জন কমে গেছে দল থেকে। যদি বাঁচতে চাও, মাথা তুলো না কেউ!'

সময় বয়ে যেতে লাগল। ছাদের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ওরা সবাই। খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙল শিকদার, 'আচ্ছা, টিক টিক শব্দটা যেন কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, না?'

'আমিও বলতে চাইছিলাম কথাটা। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে শব্দটা!' হাক্কা বলে উঠল।

একজন অনুচর বলল, 'হাঁপিয়ে যাচ্ছি আমি, কি ব্যাপার!'

শিকদার বলল, 'টিক টিক শব্দটার সঙ্গে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের সম্পর্ক আছে। সাপ্লাই বন্ধ বা কমিয়ে দিচ্ছে কারখানা থেকে। চলো, নিচে নেমে যাই সবাই। নিচে অক্সিজেন এখানকার চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু সাবধান, টর্চ জ্বালবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের পাশ ঘেঁষে দ্রুত এগিয়ে চলল দলটা। অন্ধকারেও অকারণে স্টেনগানের গুলি এদিক ওদিক ছুঁড়তে লাগল ওরা। পাতালপুরীর অধিবাসীদের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে আসছে চারদিক থেকে।

কোথায়, কোন্ দিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে শিকদারের। মিনিট পনেরো একনাগাড়ে হাঁটার পর থামল সে। পাতালপুরীর কেন্দ্রস্থল থেকে বহুদূরে চলে এসেছে তারা। এখানকার সিলিং অপেক্ষাকৃত নিচু। উপর দিকে তাকিয়ে শিকদার কথা বলে উঠল, 'আকরাম! মইটা নামিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি, সর্দার!'

একটা মই নেমে এল। সিলিংয়ের গায়ে একটা গর্ত, সেই গর্তের ভিতর দিয়ে উঠে গেল ওরা। এই সেই সুড়ঙ্গ। পাঁচ হাজার প্যাসেজ এবং অলিগলি আছে এই সুড়ঙ্গে। এই সুড়ঙ্গই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ।

'উলন আসেনি?' জানতে চাইল শিকদার।

'না, সর্দার। এত গোলমালের শব্দ কেন হচ্ছিল?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।'

খেঁকিয়ে উঠল শিকদার। দল নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগিয়ে চলল সে। প্রশস্ত, সুদীর্ঘ একটা কামরা পেরিয়ে গেল ওরা। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর এক জায়গায় থামল সবাই।

শিকদার বলল, 'বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেব আমি। উলন কি গোলমাল যে বাধিয়ে বসেছে—খোদা মালুম।'

আট

শিকদারের কথা শেষ হতেই সিন্ধু বলে উঠল, 'আমি আর নিচে নামতে রাজি নই, সর্দার। আশ্চর্য ধরনের বিপদ ওখানে। এবার নামলে নির্ঘাৎ মারা পড়ব।'

হাক্কা বলল, 'আমিও ভয় পেয়ে গেছি! সর্দার, চলো পালিয়ে যাই।'

শিকদার শুয়ে পড়েছিল। উঠে বসল সে। বলল, 'তোদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা এসেছি এমন একটা জিনিস পাবার জন্য যেটা পেলে ধনী তো হবই, এমনকি, পৃথিবীর সব ক্ষমতা আমাদের হাতে এসে যাবে।'

হাক্কা বলল, 'তোমার ওই এক কথা। ধনী হব! কিন্তু কিভাবে! ব্যাখ্যা করে বলো তো, সর্দার? কি এমন জিনিস আছে এখানে যা পেলে আমরা দুনিয়াটা দখল করে নিতে পারব?'

সবাই একযোগে দাবি জানাল, 'বলো, সর্দার। আমরা সব জানতে চাই।'

শিকদার অস্বস্তি বোধ করল। তার দলের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, টের পেল সে। উলন অবশ্য সব ব্যাপার ব্যাখ্যা করে কাউকে বলতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু এখন তার নিষেধ মান্য করা সম্ভব নয়। শিকদার অবশেষে বলল, 'শোন্ তাহলে। পাতালপুরীতে যে সোনালি আলো দেখেছিস—ওই আলোর ফরমুলাটা নিতে এসেছি আমরা। পৃথিবীতে যত সোনা আছে, তার যা দাম, তার চেয়েও বেশি দামী জিনিস ওই শীতল সোনালি আলোর ফরমুলাটা।'

'কিছুই বুঝলাম না! এই সোনালি আলো জিনিসটা কি?'

'উলনের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি আমি, বলছি।'

শিকদার বলতে শুরু করল, 'এই পাতালপুরীর অধিবাসীদের পূর্ব পুরুষরা এখানে প্রবেশ করে কয়েক হাজার বছর আগে। বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই পাতালপুরীতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। তবে তখনকার দিনে ঠাণ্ডা খুব বেশি ছিল না এই অঞ্চলে। পরে, ধীরে ধীরে, শত শত বছর ধরে বাড়তে বাড়তে ঠাণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পাতালপুরীতে আটকা পড়ে যায় উলনের পূর্বপুরুষেরা। অবশ্য বিপদ হঠাৎ আসেনি। হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে বিপদ আসতে। যাই হোক, উলনের পূর্বপুরুষরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য গবেষণা করতে থাকে। শত শত বছর পেরিয়ে যায়। অবশেষে তাদের গবেষণা সফল হয়। তখন তারা বসবাস করত এই সুড়ঙ্গ-জগতে—ল্যাণ্ড অব লস্টে। এখানে থেকেই তারা অন্ধকারে দেখতে পাবার যন্ত্র আবিষ্কার করে। এরপর তারা আবিষ্কার করে বাতাস অর্থাৎ অক্সিজেন তৈরি করার কৌশল। এই দুটো আবিষ্কার করে তারা সুড়ঙ্গ-জগৎ থেকে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। সুড়ঙ্গের নিচে তারা

পাথর কেটে তৈরি করে একটা ছোটখাটো শহর—পাতালপুরী।'

'এ তো ইতিহাস! আমরা জানতে চাইছি সোনালি আলোর কথা।'

'বলছি। উলন আমাকে বলেছে, এখানকার সবচেয়ে বড় কারখানায় বড় বড় তরল বাতাসের ট্যাঙ্ক আছে অসংখ্য। যেগুলোর সাহায্যে ঢাকার মত পঁচিশটা শহরকে গরমের দিনে বরফের মত ঠাণ্ডা করে দেয়া সম্ভব। এবার সোনালি আলো সম্পর্কে যা জানি, বলছি। এই যে সোনালি রঙ বা আলো আমরা এখানে দেখেছি এটা আসলে এক ধরনের ফস্‌ফরেসেন্ট ছাড়া আর কিছু নয়। বাতাসের সঙ্গে লক্ষ-কোটি ধূলিকণা ভাসে, তা তো জানিস? এই ধূলিকণাগুলোকে কিভাবে জানি না উজ্জ্বল করা হয়। তারপর, অদৃশ্য আলো বা এক্স-রে জাতীয় কিছু একটা ফেলা হয় সেগুলোর উপর। এরপর বিশেষ পদার্থ দিয়ে তৈরি গগল্‌স্ পরলেই যে-কেউ অন্ধকারে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। বাতাসের ধূলিকণাকে উজ্জ্বল করা হয় এবং সেগুলোর উপর অদৃশ্য আলো নিক্ষেপ করা হয় কারখানার বিরাট আকারের মেশিনের সাহায্যে।'

হাক্কা বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'এসব আমাদের মাথায় ঢুকবে না, সর্দার। আমরা জানতে চাই, টাকা কোত্থেকে, কিভাবে আসবে।'

'তুই একটা গাধা! সোনালি আলোর ফরমুলা আমরা যদি পাই, যদি সেই ফরমুলার সাহায্যে সোনালি আলো তৈরি করতে পারি, তাহলে কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে বুঝতে পারছিস না? যেহেতু সোনালি আলো একমাত্র আমাদের হাতেই থাকবে, সেহেতু অন্ধকারে সব কিছু দিনের আলোর মত দেখতে পাব আমরা। ইচ্ছা করলে, সেই আলো ব্যবহার করে আমরা বড় বড় শহরের ব্যাঙ্ক লুঠ করতে পারব। ইচ্ছা করলে সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে ঘাঁটিগুলো দখল করে নিতে পারব। ইচ্ছা করলে ফরমুলা বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারব। ভেবে দেখ, ইলেকট্রিকের কোন দামই থাকবে না। এই সোনালি আলোর ব্যবহার শুরু হলে বড় বড় ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করার ফ্যাক্টরীগুলোকে আমরা অচল করে দেবার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করতে পারব···।'

সবাই একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝেছি। বুঝেছি। নাহ্, সত্যি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে, সর্দার।'

শিকদার বলল, 'ধৈর্য হারাবি না কেউ। মেকানিক্যাল প্ল্যান্টটা দখল করতে প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছি আমরা। কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। উলনের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার আমরা চেষ্টা করব। আমাদের কাছে অস্ত্র আছে, সুতরাং সফল আমরা হবই।'

হাতের টর্চটা নাড়ছিল শিকদার। আঙ্গুলের চাপ পড়তে হঠাৎ সেটা জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে নিভিয়ে ফেলল সেটা শিকদার। দম বন্ধ করে চুপ করে রইল সে। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল।

ভুল দেখেনি শিকদার। আলো জ্বলে উঠতেই কুয়াশার আলখেল্লার একটা প্রান্ত চোখে পড়েছে তার। একটা প্যাসেজের আড়ালে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল

আলখেল্লাটা।

কুয়াশার উপস্থিতি টের পেয়েও চুপ করে রইল শিকদার। কিছুক্ষণ পরে সে বলে উঠল, 'আমাদের থাকার কথা পাতালপুরীতে নামার গর্তটার কাছাকাছি লম্বা কামরাটায়। উলন ওখানেই আসবে। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। যাক গে। শরীর বড্ড দুর্বল লাগছে। হাঁটাহাঁটি করার শক্তি পাচ্ছি না। ওখানে আমাদেরকে না দেখে উলন নিজেই আসবে এদিকে…'

শিকদারের ষড়যন্ত্র ধরতে পারল না কুয়াশা। উলন লম্বা কামরায় আসবে শুনে নিঃশব্দ পায়ে প্যাসেজ ধরে চলে এসেছে সে।

লম্বা কামরার গাঢ় অন্ধকারে অপেক্ষা করছে কুয়াশা, উলনকে কাবু করাটাই তার উদ্দেশ্য। উলনই সব ষড়যন্ত্রের হোতা।

আবাসিক ভবনের দেয়াল বেয়ে কুয়াশা ছাদে ওঠবার সময় আমীর খান গুলি করেছিল ঠিক, কিন্তু গুলির শব্দ হবার আগেই সে লাফ দিয়ে পাশের জানালা গলে একটা কামরার ভিতর ঢুকে যায়। শত্রুদেরকে ভুল ধারণা দেবার জন্য কামরা থেকে একটা ডিভান জানালা গলিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল সে। সেই ডিভান পতনের শব্দ শুনেই আমীর খান ধরে নিয়েছিল কুয়াশার মৃতদেহ নিচের রাস্তায় পড়ে গেছে।

অন্ধকারের সুযোগে কুয়াশা এরপর আবার কামরাটা থেকে জানালা গলে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠতে শুরু করে। ছাদে ওঠে সে নিঃশব্দে। তারপর থেকে কিছুক্ষণ আগে অবধি সে শিকদারের দলের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। শিকদার হঠাৎ টর্চ জ্বালতে দ্রুত সরে যায় সে একটা প্যাসেজের আড়ালে।

কিন্তু শিকদার তার আলখেল্লার একটা প্রান্ত দেখে ফেলেছে, তা কুয়াশা জানে না। জানে না বলেই শিকদারের কথাগুলো মিথ্যে অভিনয়ের অংশ বিশেষ বলে সন্দেহ হয়নি তার।

অপেক্ষা করছে কুয়াশা। উলন আসবে এখানে।

মিনিট সাতেক কেটে গেল। এরপর শোনা গেল পদশব্দ। কেউ যেন আসছে এদিকে। পদশব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খানিক পর একটা আলো দেখতে পেল কুয়াশা। টর্চের আলো। দ্রুত এগিয়ে আসছে আলোটা।

'শিকদার।'

একটা প্যাসেজের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। এগিয়ে আসতে আসতে শিকদারের নাম ধরে ডাকল একবার উলন।

উলনের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হলো না কুয়াশার। দেরি করার কোন মানে হয় না, কুয়াশা দূরত্ব হিসেব করে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল উলনের উপর।

পাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে কুয়াশা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলল উলনের দুটো হাত।

ধস্তাধস্তি শুরু করল উলন। কিন্তু কুয়াশা এমন কায়দায় ধরে রেখেছে তাকে, সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করল সে।

উলনের হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। হঠাৎ কুয়াশা চমকে উঠল।

উলন হাসছে শব্দ করে। পরমুহূর্তে চার পাঁচটা টর্চ জ্বলে উঠল। টর্চের আলোয় কুয়াশা দেখল বিশ-পঁচিশজন লোক ঘিরে ফেলেছে তাদেরকে। প্রত্যেকের হাতের রঙ সাদা। প্রত্যেকে এগিয়ে আসছে তাদের ডান হাতটা বাতাসে ফড়িংয়ের মত নাচাতে নাচাতে।

'ছেড়ে দাও আমাকে! তা না হলে বুঝতেই পারছ। তুমি ছেড়ে দিলে তোমাকে হত্যা করা হবে না।'

উপায় দেখল না কুয়াশা। উলনকে ছেড়ে দিল সে।

উলন বলে উঠল, 'এরা এখানকার পুলিসবাহিনীর লোক। কুয়াশা, তোমাকে রাজা আনায়াসার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। রাজা তোমার অপরাধের শাস্তি দেবেন। তুমি এখন বন্দী।'

দুর্বোধ্য ভাষায় পুলিসবাহিনীকে নির্দেশ দিল উলন। পুলিসবাহিনী কুয়াশাকে কড়া প্রহরার মধ্যে জেল-হাজতের দিকে নিয়ে চলল। শীতল সোনালি আলো আবার জ্বলে উঠেছে। শত্রুদের একজন কুয়াশাকে একটা গগল্‌স্ দিতে সে দেখতে পেল।

জেল-হাজতে পৌঁছুতে মিনিট বিশেক লাগল ওঁদের। পাতালপুরীর কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত সেটা।

সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো কুয়াশাকে। সেলে পা দিয়েই কুয়াশা সবাইকে দেখতে পেল। শহীদ, কামাল, রাজকুমারী, ডি. কস্টা, রাসেল—কুয়াশার আগেই পৌঁছে গেছে জেল-হাজতের সেলে।

পনেরো মিনিট পরের ঘটনা। স্থান: রাজা আনায়াসার রাজদরবার।

রাজদরবার দেখবার মত জিনিস বটে। প্রকাণ্ড একটা টকটকে লাল সিংহাসনে বসে আছেন রাজা আনায়াসা। তাঁর পোশাকও টকটকে লাল। লাল পোশাকের সর্বত্র ছোট ছোট সোনালি তারকা চিহ্ন খচিত রয়েছে। সিংহাসনের এক পাশে বসে আছে রাজকুমারী সোনা। সোনার মুখটা শুকনো। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। সোনার পাশে বসে আছে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা।

রাজদরবারের রঙের বাহার লক্ষণীয়। মোটা আর সুউচ্চ স্তম্ভগুলো এক একটা এক এক রঙের। সিলিংটা সম্পূর্ণ সোনালি। অত্যুজ্জ্বল আলোয় চারদিক ঝলমল করছে।

সিংহাসনের সামনে গোলাকার একটি মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে উলন।

উলনের পিছনে পুলিসবাহিনীর সদস্যরা। তাদের হাতে আধহাত লম্বা একটা

করে মোটা লাঠির মত জিনিস দেখা যাচ্ছে। লাঠির মাথায় ছোট্ট একটা ছিদ্র। বিষাক্ত বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র এই লাঠি।

কথা বলছিলেন রাজা আনায়াসা।

'উলন, নাগরিকদের মধ্যে তুমি ছিলে সবচেয়ে অনুপযুক্ত। কিছুদিন পর পর একটা করে কুবুদ্ধি খেলত তোমার মাথায়, অমনি তুমি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে। ক্ষমতার প্রতি তোমার লোভ ছিল অস্বাভাবিক। তুমি নরাধম এমনই শয়তান যে রাজকন্যাকে বিয়ে করার কল্পনাও মনে ঠাঁই দিয়েছিলে। ভেবেছিলে রাজ জামাতা হয়ে পরবর্তী রাজা হতে পারবে, যেহেতু আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। যাই হোক, ষড়যন্ত্র এবং বেঈমানী তুমি একবার নয়, বহুবার করেছ। তোমার অপরাধের জন্যই তোমাকে আমরা ল্যাণ্ড অব লস্টে পাঠিয়েছিলাম। সেবার তুমি রাজ পরিবারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিলে আরও কিছু অপরাধীদের নিয়ে। যাক, অতীতে তোমাকে বহুবার সাবধান করা হয়েছে, ক্ষমা করা হয়েছে—কিন্তু তুমি কান দাওনি আমাদের কথায়। আমরা…'

উলন সবিনয়ে বলে উঠল, 'মহামান্য রাজা, অতীতের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না। লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে অতীতের কথা ভাবলে। এই উলন আর সেই উলন নেই। আমি যে অপরাধ করেছি, তার জন্য মহামান্য রাজা এবং মহামান্য মন্ত্রী পরিষদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি শুধু বলতে চাই, অপরাধ আমি করেছিলাম ঠিক, কিন্তু তার বদলে আজ যে মহৎ কাজ আমি করেছি—সে কথাও আপনারা বিবেচনা করুন। বাইরের দুনিয়ার একদল গুণ্ডা, ক্ষমতালোভী, মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত মহাশত্রুকে আমি বন্দী করতে সাহায্য করেছি।'

রাজা আনায়াসা জানতে চাইল, 'এই গুণ্ডার দল, ক্ষমতালোভীর দলের সাক্ষাৎ পেলে কিভাবে তুমি?'

উলন বলল, 'ল্যাণ্ড অব লস্টে এদের সাক্ষাৎ পাই আমি। ওদের সঙ্গে, ওদের দলে যোগ দেই আমি। ওদের ভাষা শিখি। তারপর আমি জানতে পারি ওদের ষড়যন্ত্রের কথা। ওরা আমাদের পাতালপুরী দখল করার মতলব আঁটে। আমি ওদেরকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করি। আমি চেয়েছিলাম কুয়াশা এবং তার দলবল যেন কোনক্রমেই আমাদের পাতালপুরীতে নামার পথ খুঁজে না পায়। কিন্তু আমি ওদেরকে বেশি দিন ভুল পথে চালিত করতে পারিনি। একদিন হঠাৎ ওরা পাতালপুরীতে প্রবেশ করার পথ পেয়ে যায়…।'

এবার কথা বলে উঠল রাজকন্যা সোনা, 'মিথ্যে কথা! কুয়াশা এবং তার দল গুণ্ডা নয়। কুয়াশা এবং তার দলবল একবারও আমাদের নাগরিকদের বিরুদ্ধে রহস্যময় অস্ত্র ব্যবহার করেনি। রহস্যময় অস্ত্র, যে অস্ত্র প্রচণ্ড শব্দ করে এবং মানুষকে হত্যা করে, সেগুলো যারা ব্যবহার করেছে তারা উলনেরই দলের লোক। আমি তাদের সঙ্গে উলনকে দেখেছি…।'

উলন বলে উঠল, 'রাজকুমারী সোনা, আপনি ভুল দেখেননি। আমি শত্রু কুয়াশা এবং তার দলবলের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছিলাম, তাদের পরিকল্পনা জানার

জন্য।'

রাজা আনায়াসা বললেন, 'সোনা, থামো তুমি। আমি মন্ত্রী-পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করছি। তারা উলনের কথা বিশ্বাস করে কিনা জানতে চাই আমি।'

নিচু গলায় রাজা তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করলেন বেশ কিছুক্ষণ।

রাজা অবশেষে বললেন, 'উলনকে আমরা মুক্তি দিচ্ছি। তার সকল অপরাধ ক্ষমা করা হলো। সে, আসলে বীরত্বপূর্ণ একটা কাজ করেছে। সেজন্যে আমরা তাকে পুরস্কৃত করব।'

উলন চিৎকার করে উঠল, 'মহামান্য রাজা দীর্ঘজীবী হোন। মহামান্য রাজা, আমি আপনার কাছে একটা জিনিস ভিক্ষা চাইব। অনুমতি দিলে বলি।'

'বলো।' রাজা একটু যেন গম্ভীর হলেন।

'সোনালি আলোর ফরমুলাটা জানতে চাই আমি।'

রাজা বললেন, 'ফরমুলা চাও? সোনালি আলোর? কেন? তা ছাড়া, বিজ্ঞানের তুমি কি বোঝো? খুবই জটিল ব্যাপার ওটা। তোমাকে আমি বিশেষভাবে বোকা এবং বুদ্ধিহীন হিসেবে জানি। এ সব বিজ্ঞান বিষয়ক জটিলতা তোমার মাথায় ঢুকবে না।'

উলন নিরাশ হলো। কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সে বলল, 'জ্ঞান আহরণের তীব্র ইচ্ছা হয়েছে বলেই ভিক্ষাটা চাইছি আমি, মহামান্য রাজা। তবে আপনি যদি আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে না করেন—থাক তাহলে। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন, এতেই আমি সুখী। কিন্তু আরও একটা প্রার্থনা আছে আমার। এটা আপনাকে পূরণ করতেই হবে। আমি চাই কুয়াশা এবং তার দলবলকে শাস্তি দেয়া হোক। ভয়ঙ্কর এরা। যে কোন দুর্বলতার সুযোগে দখল করে নেবার চেষ্টা করবে আমাদের এই পাতালপুরী। আমি প্রার্থনা করছি, ওদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।'

রাজা আনায়াসা আবার আলোচনা করলেন তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের সঙ্গে। খানিক পর তিনি বললেন, 'কুয়াশা এবং তার পাঁচজন সহকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। প্রচলিত পদ্ধতিতে হত্যা করা হবে ওদেরকে।'

সভা ভেঙে গেল। উলন মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদের বাইরে। বেরুবার সময় রাজকুমারীর কান্না শুনতে পেল সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে উলন দ্রুত হাঁটতে লাগল। শিকদারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তাকে। রাজা আনায়াসা বড় বেশি বুদ্ধিমান, বাধ্য না হলে সে ফরমুলা দেবে না।

যুদ্ধই করতে হবে সোনালি আলোর ফরমুলা পাবার জন্য।

নয়

কুয়াশা নিচু গলায় আলোচনা করছিল শহীদের সঙ্গে। সেল থেকে নিজেদেরকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, সেটাই ওদের আলোচ্য বিষয়।

এমন সময় সেলের দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল রাজকুমারী সোনা। সোনাকে দেখে নড়েচড়ে উঠল সবাই।

দরজা ভিজিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে রাজকুমারী সোনা।

সোনা দ্রুত কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কোন কথা না বলে তার ঢোলা লাল ফ্রকের ভিতর থেকে বের করল কৃত্রিম কাপড়ের একটা থলে। থলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সে যে জিনিসটা বের করল তা দেখতে ময়দার মণ্ড বা ওই রকম জাতীয় কিছু।

কুয়াশার দিকে তাকিয়ে হাসল সোনা। কুয়াশার একটা হাত লম্বা করে ধরল সে, ইঙ্গিত করল হাতটাকে লম্বা করে রাখার জন্য।

থলের ভিতর থেকে এরপর একটা শিশি বের করল সোনা। শিশির ভিতর দুধের মত সাদা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে।

ময়দার মণ্ডের মত দেখতে প্রায় সের দেড়েক ওজনের পদার্থটা মেঝেতে রাখল সোনা। তারপর শিশির ছিপি খুলে মণ্ডের উপর ঢেলে দিল সবটুকু সাদা তরল কেমিক্যাল।

মণ্ডটা বেশ শক্ত। সোনা দুই হাত দিয়ে সেই মণ্ড ছানতে শুরু করল। দেখতে দেখতে নরম, আঠাল হয়ে উঠল সেটা।

মেঝে থেকে নরম, ভীষণ আঠাল সেই মণ্ড তুলে নিয়ে কুয়াশার ডান হাতে মাখিয়ে দিতে লাগল সোনা। দ্রুত, নিপুণ হাতে কাজ করে চলেছে সে। কুয়াশার হাতের উপর সাদা মণ্ডের একটা স্তর তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে।

অবাক বিস্ময়ে সোনার কাণ্ড দেখছিল সবাই। সোনা কি করছে তা প্রথমে বুঝতে না পারলেও খানিক পর সবাই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। উলনের এবং এখানকার নিরাপত্তা রক্ষীদের কারও কারও হাত সাদা। তাদের হাতগুলো কি দিয়ে সাদা করা হয়েছে—তা বুঝতে পারছে যেন ওরা।

দেখতে দেখতে কুয়াশার ডান হাতটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল মণ্ডের স্তরের নিচে।

সোনা হাসছে। থলে থেকে এবার সে বের করল একটা ছোট্ট কৌটা। কৌটা খুলে সোনা এবার বের করল অতি সূক্ষ্ম একটা সূচ।

সূচটা চুলের চেয়েও যেন সরু। দেড় ইঞ্চি মত লম্বা। সোনা কুয়াশার ডান হাতের তালুতে, মণ্ডের স্তরের ভিতর আড়াআড়িভাবে সেই সূক্ষ্ম সূচটা প্রবেশ করিয়ে দিল।

এরপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল সোনা। কুয়াশা ডান হাতটা একবার নাড়তেই খপ করে কুয়াশার কোমর ধরে ফেলল সোনা, হাত নেড়ে নিষেধ

করল, 'না, নাড়াচাড়া কোরো না।'

সময় বয়ে যেতে লাগল। মিনিট দশেক পর সোনা কুয়াশার ডান হাতের মণ্ডের স্তরে চিমটি কাটতে শুরু করল সর্বত্র।

কী আশ্চর্য! চিমটি কাটছে সোনা, অথচ তার নখের সঙ্গে এক কণাও মণ্ড উঠে আসছে না।

নরম মণ্ড অদ্ভুতভাবে রাবারের মত একটা পদার্থে পরিণত হয়েছে। এরপর সোনা মুখ নামিয়ে কুয়াশার ডান হাতে কামড় দিল।...সাদা মণ্ডের মত পদার্থটা কুয়াশার হাতের চামড়ার সঙ্গে নিপুণভাবে মিশে গেছে, দাঁতের কামড়েও তা আর খসছে না।

এরপর সোনা নিজের ডান হাতের আঙুলগুলো সাপের ফণার মত করে বাঁকিয়ে ফড়িংয়ের মত বাতাসের উপর নাচাতে লাগল, কুয়াশাকেও সেই রকম করার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ করল সে।

উলনের মত কুয়াশাও তার সাদা ডান হাতটা ফড়িংয়ের মত শূন্যে ওড়াতে লাগল। আঙুলগুলো বাঁকা করতেই সে দেখল তার হাতের তালুর ভিতর থেকে সূক্ষ্ম সুচটা বেরিয়ে এসেছে। হাত সোজা করলেই সেটা ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে।

কুয়াশা বলল, 'রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। উলনের হাতের তালুতে এইরকম একটা সুচই ছিল। সুচের ডগায় বিষ মাখানো আছে...'

সোনা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। থলে থেকে দ্রুত আরও কয়েকটা জিনিস বের করল সে। তার মধ্যে একটা জিনিস দেখে সবাই আকাশ থেকে পড়ল।

জিনিসটা আর কিছু নয়, ওদেরই একটা সুপার মেশিন পিস্তল।

কৃত্রিম কাগজ এবং রঙ বের করে সোনা দ্রুত ছবি আঁকতে শুরু করল। গোটা পাতালপুরীর নকশা আঁকল সে। জেল-হাজত ভবনটা আঁকল তারপর—সবশেষে আঁকল সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের নকশা। মেকানিক্যাল ভবনের একটা বিশেষ অংশে ক্রশ চিহ্ন এঁকে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর হাসতে হাসতে দরজার দিকে ছুটল।

কোন কথা না বলে সেল থেকে বেরিয়ে গেল সোনা।

'তুলনা হয় না! ভয়ানক বুদ্ধিমতী মেয়ে।' মন্তব্য করল শহীদ।

কুয়াশা বলে উঠল, 'সোনা ক্রশ চিহ্ন আঁকল কেন মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের এই অংশে? ও কি আমাদেরকে ওই বিশেষ জায়গায় যেতে বলে গেল?'

শহীদ বলল, 'নিশ্চয়ই তাই।'

কুয়াশা বলল, 'সবাই তৈরি?'

একসঙ্গে বলে উঠল সবাই, 'তৈরি।'

শহীদ এবং কুয়াশার দেহের এক ধাক্কাতেই ভেঙে গেল দরজাটা। দরজা ভেঙে পড়তেই দেখা গেল বিষাক্ত বর্শা নিক্ষেপক অস্ত্রধারী প্রহরীদের। শহীদ কালবিলম্ব না করে সুপার মেশিন পিস্তল দিয়ে গুলি করল।

বিকট শব্দ হলো। একজন প্রহরী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল করিডোরে। পরমুহূর্তে আতঙ্কিত চিৎকার উঠল চারদিক থেকে। আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দকে এখানকার মানুষরা ভীষণ ভয় করে।

চারদিকে ছুটন্ত পদশব্দ। কুয়াশা সবার আগে। তার ডান হাতটা ফড়িংয়ের মত শূন্যে নাচছে। হাঁটছে না ওরা, দৌড়ুচ্ছে সবেগে। করিডোরের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা। এমন সময় কিড়িং কিড়িং, কিড়িং কিড়িং বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। শুধু জেল-এলাকায় নয়, গোটা পাতালপুরীতে সেই শব্দ বাজছে।

রাস্তায় নেমে ওরা প্রমাদ গুণল। লোকে লোকারণ্য চারদিক। বিপদ সঙ্কেত শুনে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

শহীদের হাতের মেশিন পিস্তল গর্জে উঠতেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ঘটল। হুলুস্থুল কাণ্ড হয়ে গেল। যে যেদিকে পারছে—পালাচ্ছে।

সামনে, ডানে, পিছনে—সবদিকেই গুলি ছুঁড়ছে শহীদ। দাঁড়িয়ে নেই ওরা। অবিরাম ছুটছে।

কুয়াশা বলে উঠল, 'পিছু ছাড়েনি পুলিসের দল। আসছে তারা আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে।'

'আমি ভাবছি এভাবে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে এদেরকে!' শহীদ বলল।

কুয়াশা বলল, 'সোনার নির্দেশ মত ক্রশ চিহ্নিত জায়গাটা দেখি আগে। তারপর চিন্তা করা যাবে নতুন করে।'

সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টে ঢোকার সময় কেউ বাধা দিল না ওদেরকে। আড়াল থেকে কিছু লোক চিৎকার করছে শুনতে পেল ওরা।

'সিঁড়িটা কোন্‌দিকে?'

কামালের প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা বলল, 'সিঁড়ি খোঁজার সময় নেই। ওই দেখো, মই!'

মইটা সোজা উঠে গেছে পাঁচতলার উপব পর্যন্ত, ভবনের মাঝামাঝি উচ্চতায়।

'পাঁচ তলারই একটা অংশে ক্রশ চিহ্ন এঁকেছিল সোনা!'

মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওরা। সবার আগে কুয়াশা। শহীদ সবচেয়ে নিচে।

ত্রিশ ফিটের মত উপরে উঠে শহীদ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল দলে দলে এগিয়ে আসছে লোকেরা। সবাই মারমুখো, পেলে বুঝি কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। গুলি করল শহীদ।

তীরবেগে আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই।

পাঁচ তলায় উঠে করিডোর ধরে ছুটল ওরা। শেষ প্রান্তে একটি দরজা। সেটা খোলা দেখে ভিতরে ঢুকল।

কামরার ভিতর ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। বিরাট বড় কামরা। প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল, এটা সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল প্ল্যান্টের ল্যাবরেটরি। ছোট বড় হাজার রকম যন্ত্রপাতি, মেশিন, কেমিক্যাল ভরা পাত্র—কোন কিছুরই অভাব নেই।

শহীদ হঠাৎ ছুটল। প্রায় চিৎকার করে উঠল সে, 'একি!'

সবাই দেখল ব্যাপারটা। ওদের স্পেসক্রাফটের ভিতর ওরা কিছু অস্ত্র, কিছু অতি প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল রেখে এসেছিল। সেগুলো একটা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল কুয়াশা। বলল, 'আমাদের জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য স্পেসক্রাফট থেকে এখানে নিয়ে এসেছে এগুলো। যাক, সোনা কেন এখানে আসতে বলেছিল, বোঝা গেল এবার।'

'কুয়াশা!' চিৎকার করে উঠল রাজকুমারী। তাকিয়ে আছে সে ল্যাবরেটরির সিলিংয়ের দিকে। সবাই তাকাল উপর দিকে।

সিলিংয়ের গায়ে অনেকগুলো পাইপ দেখা যাচ্ছে। একই ধরনের পাইপ দেয়ালের গায়েও অনেক রয়েছে। সিলিংয়ের একটা পাইপ দিয়ে মেঝেতে তরল পানির মত কিছু পড়ছে। মেঝেতে পড়েই তরল পানি কঠিন বরফে পরিণত হচ্ছে, হু-হু করে বাষ্প ছড়াচ্ছে চারদিকে। পানি পড়ছে সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য পানি থেকে বাষ্প তৈরি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

শহীদ বলে উঠল, 'লিকুইড এয়ার। তরল বাতাস!'

'ক্ষতিকর?' জানতে চাইল কামাল।

'ক্ষতিকর মানে? ওই লিকুইড এয়ার লোহার গায়ে পড়লে লোহাও বরফ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে!'

কুয়াশা বলল, 'অক্সিজেন কমে যাচ্ছে। টের পাচ্ছ তোমরা?'

শহীদ বলল, 'ওই বাষ্পগুলো খেয়ে ফেলছে অক্সিজেনকে!'

'তারমানে এই ল্যাবরেটরিতে মরবার জন্য ঢুকেছি আমরা!'

কামালের কথার উত্তর দিল না কেউ।

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, আত্মসমর্পণ করাই এখন একমাত্র উপায়, কি বলো?'

শহীদ বলল, 'এখন প্রশ্ন হলো, ওরা মৃত্যু-ফাঁদে আটকে ফেলেছে আমাদেরকে। আমরা আত্মসমর্পণ করতে চাইলেও কি রাজি হবে ওরা?'

রাসেল তড়াক করে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে। দেয়ালের একটা পাইপ থেকে খানিকটা লিকুইড এয়ার পড়ল মেঝের উপর, খানিকটা একটা টেবিলের উপর।

টেবিলের উপর কয়েকটা পাত্র ছিল। সেগুলোর উপর শক্ত বরফের মোটা আস্তরণ সৃষ্টি হলো। বরফে ঢাকা পড়ে গেল টেবিলসহ সব কিছু।

আতঙ্ক ফুটে উঠল ওদের চোখেমুখে।

'কুয়াশা!'

কিন্তু কোথায় কুয়াশা! প্রথমে ওরা কুয়াশাকে দেখতেই পেল না। এদিক ওদিক তাকাল ওরা। দেখল, কুয়াশা একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন পাত্র থেকে কেমিক্যাল একটু একটু করে অপর একটি পাত্রে ঢালছে। শহীদ দরজার

দিকে ছুটে গেল। ধাক্কা দিয়ে দেখল ও। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিসবাহিনী।

মিনিট দুয়েক পর মুখ তুলল কুয়াশা। বলল, 'এটা এখানকার সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি। লিকুইড এয়ার ঢেলে ল্যাবরেটরিটাকে নষ্ট করবে না ওরা পারতপক্ষে। ওরা আসলে আমাদের ভয় দেখিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে চাইছে। ভাল কথা, এই ওষুধটা এক চুমুক করে খেয়ে নাও সবাই।'

বিনাবাক্যব্যয়ে কুয়াশার হাত থেকে ওষুধভরা পাত্র নিয়ে সবাই তা পান করল।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। টোকা দিল সে দরজার গায়ে।

আশ্চর্য, খুলে গেল দরজা।

মাথার উপর হাত তুলে করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। সাদা হাতওয়ালা পুলিসবাহিনী তৈরি হয়েই ছিল। সর্বমোট প্রায় পঞ্চাশজন। ঘিরে ফেলল তারা ওদেরকে।

কড়া প্রহরার মধ্যে ওদেরকে নামিয়ে আনা হলো এক তলায়।

প্রকাণ্ড একটা হলরুমের মাঝখানে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে উগ্র কণ্ঠস্বর। সবাই চাইছে, কুয়াশার দলকে উচিত শাস্তি দেয়া হোক।

কুয়াশা এবং শহীদ হলরুমটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সেই সময়। আকারে এত বড় হলরুমটা যে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পরিষ্কার দেখা যায় না। হলরুমের উচ্চতাও অস্বাভাবিক। প্রায় দশ মানুষ সমান উঁচুতে রয়েছে সাত থেকে দশ টন ওজনের সারি সারি ঝুলন্ত ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কগুলোর ভিতর থেকে মোটা মোটা পাইপ বেরিয়ে এসেছে। পাইপগুলো দেয়াল বেয়ে খানিকদূর নেমে এসেছে, তারপর বেরিয়ে গেছে বাইরের দিকে।

পুলিসবাহিনী ঘিরে রয়েছে ওদেরকে। এই মুহূর্তে তারা শাস্তি দিতে চায় কুয়াশার দলকে, দেখে তা মনে হয় না। মনে হচ্ছে, তারা যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

সত্যিই তাই। তারা অপেক্ষা করছিল স্বয়ং মহামান্য রাজা আনায়াসার জন্য।

রাজা আনায়াসা এবং রাজকুমারী সোনা হলরুমে ঢুকল। পুলিসবাহিনী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করল। রাজার পিছু পিছু এল মন্ত্রী-পরিষদের কয়েকজন সদস্য।

রাজা আনায়াসা দ্রুত কিছু বললেন। সম্ভবত একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন তিনি। হঠাৎ থামলেন তিনি। তারপর দুর্বোধ্য একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'কুম! কুম!'

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা।

দশ-পনেরো জন সাদা হাতওয়ালা পুলিস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তাদের ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করল কুয়াশাকে এবং কুয়াশার বন্ধু-বান্ধবকে।

ঘটে গেল চরম সর্বনাশ! বিষাক্ত, সূক্ষ্ম সুচের আক্রমণে টলে উঠল কুয়াশা,

শহীদ, কামাল, ডি. কস্টা, রাজকুমারী এবং রাসেল। নিষ্প্রাণ মহীরুহের মত সবাই একসাথে টলতে টলতে পড়ে গেল।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল রাজকুমারী সোনার কণ্ঠ থেকে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে।

রাজা আনায়াসা গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'শত্রুদের উচিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।'

ন্যায়ের পথে যারা নিবেদিত প্রাণ, আজ বুঝি তাদের পরাজয় ঘটল।

এরপরও ঘটনা ঘটল। কিন্তু তা ঘটল ন্যায়ের বিরুদ্ধেই—তা ঘটল অন্যায়ের স্বপক্ষেই।

রাজার ঘোষণা শেষ হবার পরপরই দোরগোড়া থেকে গর্জে উঠল শিকদারের স্টেনগান।

আর্তচিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে একে একে পুলিসবাহিনীর সদস্যরা।

শিকদার একা নয়, গুলি করছে হাক্কা, গুলি করছে উলন, গুলি করছে খুনীদের আর সব অনুচরেরা।

কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে শুধু রাজা আনায়াসা, তার মেয়ে সোনা এবং মন্ত্রী-পরিষদের মাত্র একজন সদস্য। বাকী সবাই হয় আহত নয় নিহত হয়েছে।

'বেঁধে ফেলো রাজাকে!' উলনের নির্দেশ পেয়ে শিকদারের পোষা গুণ্ডারা পকেট থেকে নাইলনের কর্ড বের করে বেঁধে ফেলল রাজা, সোনা এবং মন্ত্রীকে।

'উলন! তুই আবার বেঈমানী…'

রাজাকে ধমক মারল উলন, 'চুপ শালা! এখন বল, ফরমুলা দিবি কি না?'

'কি আর করবি তুই আমার! বড় জোর মেরে ফেলবি! তাই কর—মেরে ফেল। কিন্তু ফরমুলা আমি দেব না…'

শিকদার স্টেন উঁচিয়ে ধরল, 'শালা বড্ড হারামি! মর ব্যাটা রাজা…'

'না!' গর্জে উঠল উলন। রাজাকে এখুনি মারতে চায় না সে। ফরমুলা আদায় করতে হলে রাজাকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু স্টেনের ট্রিগারে আঙুলের যথেষ্ট চাপ দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে শিকদার।

উলন শিকদারের স্টেনগান ধরা হাতটা উপর দিকে ঠেলে দিল।

এক ঝাঁক বুলেট গিয়ে বিদ্ধ হলো মাথার উপরের লিকুইড এয়ার ট্যাঙ্কে।

জলপ্রপাতের মত লিকুইড এয়ার নেমে এল নিচের দিকে।

শিকদার, উলন,—তাদের সব ক'জন অনুচরের গায়ে পড়ল লিকুইড এয়ার।

ঠিক সেই সময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বয়ং কুয়াশা। প্রায় একই সময়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ, কামাল, ওমেনা, ডি. কস্টা এবং রাসেল।

সূক্ষ্ম, বিষাক্ত সুচের আঘাতে মরেনি ওরা। বিষের ক্রিয়া যাতে মৃত্যু ডেকে না

আনে তার জন্য কুয়াশা ল্যাবরেটরিতে থাকার সময় একটা অ্যান্টিডোট তৈরি করে সবাইকে খাইয়ে দিয়েছিল। ফলে এযাত্রা বেঁচে গেছে ওরা। বিষ ক্রিয়ায় সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মাত্র!

কুয়াশার দেখাদেখি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত পুলিসবাহিনীর লোকদের সরিয়ে নিয়ে গেল হলরুমের বাইরে। ডি. কস্টা সোনার অচেতন দেহটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল করিডোরে।

কুয়াশা মহামান্য রাজা এবং মন্ত্রী মহোদয়কে লিকুইড এয়ারের স্রোতের আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল।

করিডোরে এসে দু-জনকে কাঁধ থেকে নামাল কুয়াশা। তারপর হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলে দিল তাদের।

শহীদ হলরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে তাকাল সে। আপনা থেকেই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল ওর।

শিকদার এবং উলনের দল দাঁড়িয়ে আছে হলরুমের মেঝেতে। তাদের শরীরে মাংস, হাড়, রক্ত, চুল—কিছুই নেই। বরফ দিয়ে তৈরি মূর্তি, নিষ্প্রাণ মূর্তি ছাড়া কিছুই নয় ওরা।

উত্তর মেরুর বরফাচ্ছাদিত জগতের নিচে, পাতালপুরীতে কেটে গেল সুদীর্ঘ দুটো মাস।

কুয়াশার দল পাতালপুরীর অধিবাসীদের ভাষা শিখে ফেলেছে ইতিমধ্যে। শুধু ভাষাই নয়, তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর রহস্য সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞান আহরণ করল ওরা। বাইরের পৃথিবীতে সোনালি আলো আসলে কোন কাজেই লাগবার নয়, জানতে পারল ওরা। কারণ এই আলো সেখানেই জ্বলবে যেখানকার বাতাস সম্পূর্ণ শুষ্ক। তেমন শুষ্ক বাতাস বাইরের পৃথিবীর কোথাও নেই।

কিন্তু এই তথ্যটা উলন বা শিকদার জানত না। আর জানত না বলেই তারা অমন ভয়ঙ্কর ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

রাজা আনায়াসার কাছ থেকে একটি তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যটা হলো, উলনকে পাতালপুরীর গোলক ধাঁধায় রেখে আসার প্রায় মাস দুয়েক পর কয়েকজন প্রহরী গোলক ধাঁধায় যায় বিশেষ একটি কারণে। সেখানে গিয়ে তারা কয়েকজন বিদেশী লোকের লাশ দেখে।

কুয়াশা বলল, 'বুঝেছি। শিকদার এবং উলনই ওদের মৃত্যুর জন্য দায়ী সম্ভবত। ওরাই আইস অভিযানের সদস্য ছিল।'

পাতালপুরীর অধিবাসীদের সংখ্যা নিয়ে কথা উঠল। কুয়াশা প্রস্তাব দিল কিছু লোককে বাইরের দুনিয়ায় স্থানান্তরিত করার।

পাতালপুরীর বাসিন্দারা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে হাজারটারও বেশি প্রশ্ন করল। কুয়াশা এবং শহীদ তাদের সব প্রশ্নেরই যথাসাধ্য উত্তর দিল।

রাজা জানালেন, 'না, আমরা আমাদের এই পূর্বপুরুষদের তৈরি

পাতালপুরীতেই থাকব। তোমাদের দুনিয়াটা, তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী খুব একটা সুখের বা আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু, কুয়াশা, বন্ধু আমার—আমার একটা প্রার্থনা আছে তোমার কাছে।'

'বলো!'

রাজা আনায়াসা কুয়াশার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন। বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিলে কুয়াশা তা গ্রহণ করে।

রাজা বললেন, 'আমি প্রার্থনা করছি, আমাদের এই পাতালপুরীর অস্তিত্বের কথা তুমি বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে কাউকে বোলো না। বেশ শান্তিতে আছি আমরা। কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করুক তা আমরা চাই না।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে আনায়াসা!'

বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল।

রাজা, রাজকন্যা সোনা, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ওদের সঙ্গে সুড়ঙ্গের শেষ সীমা পর্যন্ত হেঁটে এল।

রাজা আনায়াসা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে অনুরোধ, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আর একবার এসে দেখা করে যেয়ো।'

কুয়াশা বলল, 'নিশ্চয়ই আসব, আনায়াসা। তোমার কথা আমি ভুলতে পারব না। বিদায়, বন্ধু!'

'বিদায়, বন্ধু!'

সুড়ঙ্গের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল রাজা দলবল নিয়ে।

কুয়াশার দল স্পেসক্রাফটের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে স্পেসক্রাফটের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

খানিক পর স্পেসক্রাফট আকাশে উঠতে শুরু করল।

'ওহে, ডি. কস্টা, তোমার প্রিন্স কই?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কামাল।

ডি. কস্টা উত্তর দিল না। ভীষণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

কুকুরটাকে পাতালপুরীতে রেখে এসেছে ডি. কস্টা। না, ভুলে রেখে আসেনি। ওটা দান করেছে সে রাজকুমারী সোনাকে।